ইউভাল হারারি
পাঠ ও মূল্যায়ন

পশ্চিমা অ্যাকাডেমিকদের চোখে

রাফান আহমেদ

ইউভাল হারারি পাঠ ও মূল্যায়ন
পশ্চিমা অ্যাকাডেমিকদের চোখে

গ্রন্থস্বত্ব © গ্রন্থাকার ২০২১
১ম প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০২১

ISBN: 978-984-34-8910-4

প্রচ্ছদ: ThinkTwice
পৃষ্ঠাসজ্জা ও ইলাস্ট্রেশান: রাফান আহমেদ

প্রকাশক: মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

মিনারাহ পাবলিকেশন্স
minarahbd@gmail.com
www.facebook.com/minarahpublicationsbd

নির্ধারিত মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

Yuval Harari: A Critical Analysis by Rafan Ahmed.
Published by Minarah Publications, First Edition 2021.
USD 5

যারা ‘কান নিয়েছে চিলে’ ভেবে ছুটে না

তাদের জন্য

লেখকের অন্যান্য বই:

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা
অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়
হোমো স্যাপিয়েনস: রিটেলিং আওয়ার স্টোরি
ভাবনার মোহনায়
প্রত্যাবর্তন (সহলেখক)
অবিশ্বাসের বিভ্রাট (সহলেখক)
তাঁর কালামের মায়ায় (সহলেখক)
জবাব (সহলেখক)

এক নজরে

০৯ প্রবেশিকা

১৪ বিজ্ঞানবাদের ছোবল

১৮ দর্শনের ভুলভুলাইয়া

২৫ হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস

৩৪ নৈতিকতায় নায়েলিজম

৪১ বিপ্লবে ভজঘট

৫১ ধর্ম নিয়ে যতকথা

৬৭ বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

৭৫ অ্যাকাডেমিকদের রায়

৮১ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

৮২ দোহাইনামা

প্রবেশিকা

আমরা অনেকেই ইতিহাসের শিক্ষক ইউভাল নোয়াহ হারারি রচিত *Sapiens: A Brief History of Humankind (Vintage books, 2014)* বইটির নাম শুনেছি। বইটি ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় হিব্রু ভাষায়, নাম ছিল קיצור תולדות האנושות (কিতসোর তোলদোথ হা-নুশুথ)। ইংরেজি অনুবাদ হয় ২০১৪ সালে। বইটিতে আলোচিত হয়েছে মানব-পূর্ব হোমিনিড থেকে দুপেয়ে মানুষের আবির্ভাব যেখানে *হোমো স্যাপিয়েনস*-সহ হোমো গণের সকলকেই 'মানুষ' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এরপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব, কৃষিবিল্পব, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব পেরিয়ে মানবজাতির বিস্তারের ছবি আঁকা হয়েছে। কীভাবে বর্তমানে এসে মানুষ নিজেদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে জলবায়ু বিভ্রাট ও আণবিক বোমার দ্বারা তাও লেখকের কলমে দেখা দিয়েছে। সোজা কথায়, সংক্ষেপে মানবজাতির ইতিহাস ও সম্ভাব্য পরিণতি আঁকা হয়েছে।

প্রকাশিত হবার কয়েক বছরের মাঝেই বইটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ, বারাক ওবামা, মুহাম্মদ জাফর ইকবালের মত নামিদামি মানুষেরাও বইটি পড়তে উৎসাহ দিতে থাকেন। বইয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে আরো। লেখককে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ডাকা হতে থাকে। সঞ্চালকের দায়িত্বের হলিউডের

মূল হিব্রু সংস্করণ

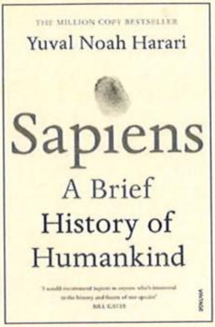

ইংরেজি সংস্করণ

নামকরা নায়িকাকে দেখা যায় কোনো কোনো অনুষ্ঠানে। ফেসবুক, ইউটিউবে এনিয়ে হুলুস্থুল কারবার চলেছে অনেক। লেখকের সাক্ষাৎকার আর লেকচারে জ্যাম হয়ে আছে। সেই হুজুগ বন্ধ হয় নি এখনো। সেলিব্রেটি কালচারের গড্ডালিকায় চলে হালফিলের তারুণ্য। দুনিয়াটা বইয়ের হোক বলেও ডুবে থাকে সেই তারকাধ্যানে। মানের চেয়ে স্বাদ, আবেগ আর ঘ্রাণেই মজে থাকে রাতবিরেতের অনেক বইপোকা। এতটাই মজে যায় যে বড়সড় গর্তও চোখে পড়ে না। বিশ্বব্যাপী তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে যে বই তাতে কি আর ভুল থাকতে পারে! বালাই ষাট!

আমি যখন এই পাঠ-পর্যালোচনা লিখছি তখন দেখতে পাই বইটি নিয়ে দেশে নতুন করে উন্মাদনা জাগাচ্ছে একদল প্রগতিশীল। বইটি কেনা না বরং অর্জনের ছবক দিচ্ছে। আমরা তাদের আকুলতা বুঝতে পারি। কেউ বস্তুবাদি বা নাস্তিক হিসেবে ঘোষণা করলেও সে জীবনের অর্থদোতন্যার সন্ধান বাদ দিতে পারে না। নাস্তিকতার পরিনতি ধ্বংসবাদ বা নায়েলিজম—অস্তিত্ব ও নৈতিকতা দুই দিকেই। কিন্তু বাঙালিরাসহ বিশ্বের অধিকাংশ নাস্তিকই সেটা মানতে পারে না। জীবনগাড়ি চালানোর জন্য তাদের স্টেশানের ঠিকানা লাগে, মনে স্থিরতা আনা লাগে। হয়তো হারারির বই থেকে তারা সরল ভাষায়

সেই স্থিরতা পেয়েছে ভেবে বসে। অথচ হারারি নিজে বস্তুবাদি-সমকামি হওয়া সত্ত্বেও সেই স্থিরতা খুঁজার চেষ্টা করেন ধ্যানে!

কি অদ্ভূত স্ববিরোধীতা!

হারারির বই পাঠ-পর্যালোচনা করার যোগ্যতা আমার আছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলতে পারেন কেউ কেউ। তার আছে অক্সফোর্ডের ডিগ্রী এবং তুমুল জনপ্রিয়তা; অথচ আমি এক ছা-পোষা ডাক্তার মাত্র। লোকে যাদের কসাই বলে আনন্দ পায়। সাহস কত ছোকরার! সচেতন কেউ এই প্রশ্ন শুনে ভাবতে পারেন, আমাকে এমন অভিযোগ ছুড়ে দেয়া প্রগতিশীলরা ইসলাম নিয়ে কোনো রকম কাঠামোবদ্ধ পড়াশোনা না করেই মনে যা আসে সেভাবে ইসলামের উৎস অপব্যাখ্যা করেন, মনগড়া অভিযোগ করেন, লাইভে লাইভে মিথ্যের আসর সাজান। এমন কেউ আমাকে ঐ প্রশ্ন করার নৈতিক অধিকার কী আদৌ রাখেন?

তবে আমি এই পালটা প্রশ্নের সাথে তাল না মিলিয়ে বলতে চাই, বক্ষ্যমাণ পাঠপর্যালোচনায় আমি নিজের কথা খুব কমই বলেছি। উইকিপিডিয়াতে *স্যাপিয়েনস: আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ হিউম্যানকাইন্ড* বইটির পেইজে Scholarly reception অংশটিতে পশ্চিমা সেক্যুলার অ্যাকাডেমিক ও পর্যালোচকেরা কীভাবে বইটিকে মূল্যায়ন করেছেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলোকে সাথে নিয়ে আমার পড়াশোনার সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করেছি বইটি বিশ্বব্যাপী যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা অ্যাকাডেমিকভাবে কতটা গ্রহণযোগ্য। সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন বিজ্ঞানের অনেক বিষয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণার সাথে প্রকৃত ধারণার দূরত্ব রয়ে যায়। বিজ্ঞানের নাম করে স্বীয় বিশ্বাস গেলান তুমুল জনপ্রিয় সেলিব্রেটি বিজ্ঞানীরা। একই সাথে সুস্থচিন্তার পাঠকেরা খুব ভালভাবেই বোঝেন কোনো বই তুমুল জনপ্রিয় হওয়া মানেই যে তা যে বৈজ্ঞানিক মহলের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করবে বা ইতিহাসের সঠিক চিত্রায়ন থাকবে এমনটি নয়।

বরং উল্টোটাই দেখা যায়। বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় বইগুলোতে ভুলের আধিক্যের কারণে অ্যাকাডেমিকরা এসব বই পড়তে আগ্রহ কমই পান। বলা হয়ে থাকে জ্ঞানের স্ব-স্ব শাখার বিশেষায়ন নির্দিষ্ট মাত্রায় জলাঞ্জলি না দিলে পাঠকের মুখে সে-সব বিষয়ের বই রোচে কম। বিকোয় কম, হুজুগেও আসে কম।

মাতৃভাষায় এই বইটি গোছানোর পরিকল্পনা আমার ছিল না। শুভাকাঙ্খিদের একাংশ খুব তাড়া দিলেন। তাই একটু অগোছালোভাবেই কলম ধরতে হলো, মানে কি-বোর্ড চাপতে হলো আরকি। আশা করি বোদ্ধা পাঠকেরা আমার ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পাঠ-পর্যালোচনা বা বুক রিভিউ সচরাচর ১২০০ শব্দের কাছাকাছি হয়। অর্থাৎ মূল বইয়ের চেয়ে অনেক কম। এটাই পাঠ-পর্যালোচনার রীতি। এই বাস্তবতা না জেনে কেউ যদি বলেন—এহ! ৪৫০ পেইজের মূল বইকে ৭০-৮০ পেইজেই কাটাছেড়া করল! কি হাস্যকর!—তাদের জন্য সমবেদনা। যে সকল পশ্চিমা সেক্যুলার পণ্ডিত (ড. হলপাইক, ড. গিডেয়ন পলিয়া, জন সেক্সটন প্রমুখ) হারারির বইয়ের অ্যাকাডেমিক কবর রচনা করেছেন তাদের রিভিউ ছিল ১২-২২ পৃষ্ঠার মত। এর চেয়ে বড় রিভিউ আমি পাই নি।

আশা রাখি যারা গড্ডালিকায় হারিয়ে যান নি তারা এই আলোচনা থেকে উপকৃত হবেন। যারা হারিয়ে গেছেন তাদের জন্যও আশা রাখি। হয়তো তারা আবার ভাববেন নিজেদের আবেগ সম্পর্কে।

আশাই জীবনের শ্বাস।

শুভকামনা সবার জন্য।

রাফান আহমেদ

১৪ জানুয়ারি ২০২১, অপরাহ্ন

পাঠ-পর্যালোচনা

বিজ্ঞানবাদের ছোবল

বইমেলার অপরাহ্ন। দিনশেষে ফেরার তাড়া। মেলায় একবারই যাওয়া হয় সুযোগ পেলে। পরিচিত কিছু মুখের সাথে আড্ডা দেয়ার লোভটা তাই সংবরণ করি না। আমার এক সুহৃদকে অটোগ্রাফসমেত বই উপহার দিলাম। মেলা থেকে ফেরার পথে সুহৃদ আমার হাতে তুলে দিল দুইটি বই। দুটোরই লেখক ইউভাল নোয়াহ হারারি। নিউমার্কেটের পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত এসে আমি নিলাম মিটফোর্ডের পথ, আর আমার সুহৃদ চলে গেলো লালবাগে।

দুইটি বইয়ের একটি ছিল *স্যাপিয়েনস: আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ হিউম্যানকাইন্ড*। এর আগে যদিও বইটা অন্তর্জালে নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম, তবে পুরোটা পড়া হয় নি। এবার বইটি আয়েস করে পড়তে বসে যাই। আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্লোমো শান্দের মত। উনি প্রথম অধ্যায়ে কিছুদূর গিয়েই বইটি রেখে দিয়েছিলেন। আর আমি একেবারে প্রথম পাতাতেই বিরক্ত হয়ে বই রেখে দিয়েছিলাম।

কেন?

শুরুতেই বিজ্ঞানবাদী চেতনা আর বিজ্ঞানের অতিসরলিকৃত উপস্থাপন দেখে। বিজ্ঞানবাদ (Scientism) একটি স্ববিরোধীতা ও কুযুক্তিপ্রসূত মতাদর্শ। এই মতাদর্শে দীক্ষিতরা মনে করে বিজ্ঞানই

সত্য বা নির্ভরযোগ্য সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম। বলাই বাহুল্য, এমন চিন্তা নিজেই বিজ্ঞানের বাইরে অবস্থিত। এটা জ্ঞানতাত্ত্বিক বা এপিস্টেমোলজিক্যাল দাবি; যা বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করা সম্ভব না। বিজ্ঞানবাদ এভাবেই নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারে।[১] হারারি আলোচনা করেছেন মানুষের ইতিহাস, কিন্তু শুরু করেছেন বিজ্ঞান থেকে। অর্থাৎ মানবিক বিষয়ে বা হিউম্যানিটিজের আলোচনা শুরু করেছেন বিজ্ঞান দিয়ে। অথচ এরা দুইটা ভিন্ন ফিল্ড। ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি এগুলো আদৌ 'বিজ্ঞান'-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মাঝে আজও বিতর্ক চলছে। বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সে অনেক কিছুরই সমাধান দিতে পারে না। হিউম্যানিটিজ বিষয়াদি দিয়ে সেসবের আলাপ হয়। যদিও উত্তর-এনলাইটেনমেন্ট কালে এসব প্রশ্নের উত্তরও স্রেফ জাগতিক সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে এভাবে টেনেহিঁচড়ে সোশিয়াল সায়েন্সে নিয়ে আসা হলো বিজ্ঞানবাদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমন বিরক্তিতে আমি একাই পড়েছি এমন নয়। আমার মতই বিরক্ত হয়েছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্যুলার পণ্ডিত জন সেক্সটন। তিনি হারারির বইয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন[২]:

> The primacy of science—that is, of the modern physical and biological sciences, and their spillover into the social sciences—is the first article of faith for progressives... Harari is so committed to a scientific view of human history that he never seems to question whether a method invented to understand and master nature is really suited to understanding fully the nature of man himself, and whether man is the same kind of object as many of the others that science studies

অর্থাৎ, ‘প্রগতিবাদীদের আকিদার প্রথম খুঁটি হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—বিশেষ করে অধুনা পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যাকে মুখ্য মনে করা আর সামাজিক বিজ্ঞানের ওপরে এদের ঠেসে ধরা... হারারি মানবেতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এতটাই মজে গেছেন যে প্রকৃতিকে বোঝা ও বাগে আনার এই পদ্ধতি আদৌ মানবের প্রকৃতি পুরোপুরি বুঝে ওঠার ক্ষমতা রাখে কিনা—এই প্রশ্ন তিনি তুলেন নি। বিজ্ঞান যে জিনিস নিয়ে গবেষণা করে মানুষের প্রকৃতিও তেমন জিনিস কিনা এই প্রশ্নও তার ঘটে আসে নি।’

> “মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায় আবার যদি ভরসা না করে তা হলে কার ওপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার ওপর ভরসা করবে?”
>
> ড. জাফর ইকবাল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স (পৃ. ০৯)

একবিংশ শতকের শুরুতেই এসব প্রশ্ন নিয়ে নামকরা (নাস্তিক) দার্শনিক ও *আমেরিক্যান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য অ্যাডভানসমেন্ট অফ সায়েনস*-এর ফেলো জন ডুপ্রে *Human Nature and the Limits of Science (Oxford: Oxford university press, 2001)* গ্রন্থ রচনা করে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানবাদী সাম্রাজ্যবাদ (scientific imperialism) কিভাবে অ্যাকাডেমিয়া থেকে নিয়ে আমজনতার পরিবেশ বিষিয়ে তুলছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে স্বজায়গা থেকে অন্য জায়গায় টেনে এনে ভয়াবহ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। কয়েকবছর আগে আরেক দার্শনিক হুইটলি কফম্যান *Human Nature and the Limits of Darwinism (Palgrave Macmillan, 2018)* গ্রন্থে দেখিয়েছেন বিবর্তন দিয়ে মানব প্রকৃতির ব্যাখ্যার নানাবিধ সমস্যা ও ট্রেডিশনাল ব্যাখ্যাই যে মানবপ্রকৃতিকে উত্তম অনুধাবনে সাহায্য করে সেই বাস্তবতা।

হারারি এতসব ভাবতে যান নি। বিজ্ঞানবাদী চেতনার সাথে বস্তুবাদ ও আপেক্ষিক নৈতিকতার মশলা দিয়ে মানব ইতিহাসের খিচুড়ি রান্না করেছেন। নিজে কেবল ঐতিহাসিক হয়ে নৃতত্ত্ব, জীববিদ্যা, দর্শন, রাজনৈতিক মতাদর্শ, নৈতিক দর্শন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে আলাপ জুড়তে গিয়ে প্রায়ই পথহারা হয়েছেন। অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদের ভাষায় বললে—তিনি ঠিকমত পড়াশোনা করেন নি, মানবেতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বেমালুম চেপে গেছেন, লাগামহীন কল্পনা করেছেন। ইউরোসেন্ট্রিক-অ্যাংলোসেন্ট্রিক-জায়নবাদি-নব্যলিবারেল বয়ানে মানুষের ইতিহাস লিখেছেন সরল-আকর্ষনীয় ভাষায়। ওপরন্তু সেলিব্রেটিজম আর মিডিয়ার কল্যাণে বহুল প্রচার পেয়েছেন। আর দুনিয়াটা বইয়ের হোক ধরণের পাঠকেরা সেটা দেদারসে গিলেছেন। অনেকেই ধর্মহারা হয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

চলুন অ্যাকাডেমিকরা কেন এমন বললেন তা জেনে আসা যাক।

দর্শনের ভুলভুলাইয়া

স্যাপিয়েনস বইটির ক্রিটিক্যাল পর্যালোচকদের মধ্যে একজন হলেন নামকরা নৃতত্ত্ববিদ ও অ্যামিরেটাস অধ্যাপক ড. ক্রিস্টোফার হলপাইক। নৃতত্ত্ববিদ্যা নিয়ে তার প্রথম গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে, ইউভাল নোয়াহ হারারি'র জন্মেরও চার বছর পূর্বে। এ থেকে নৃতত্ত্ববিদ্যায় তার জ্যেষ্ঠতা, জ্ঞানের পরিধি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি।

স্যাপিয়েনস বইটিও নৃতত্ত্বের আলোচনাতে মুখর। কিন্তু ড. হলপাইক তার পাঠ-পর্যালোচনায় ক্ষোভের সাথে বলেছেন, হারারি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দূর্বল। একই সাথে তিনি বইটিকে বিজ্ঞানের প্রতি উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে না ভাবার অনুরোধ জানিয়েছেন! পর্যালোচনার শেষাংশে তিনি জানান—হারারি তার বইতে থাকা বিষয়সমূহের অনেকগুলো নিয়েই পর্যাপ্ত পরিমাণে পড়াশোনা করেননি। এখান থেকেই বুঝে ফেলা যায় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে হারারি ও তার বইটিকে নিয়ে যে উচ্চ ধারণা রয়েছে তার অ্যাকাডেমিয়াতে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু। উল্লেখ্য, ড. ক্রিস্টোফার হলপাইক নিজেও একজন ডারউইনবাদি। তিনি ক ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং নৃতত্ত্ববিদ্যায় তার অধ্যাপনা ও ডারউইনের মতবাদের কাঠামো থেকেই বইটির সমালোচনা করেছেন। সে আলোচনায় যাবার আগে কিছু বুনিয়াদি আলাপ সেরে নিই।

ডারউইনের বিগলযাত্রা

স্যাপিয়েনস বইটিতে ইউভাল হারারি একদম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে জীববিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে সৃষ্টিকর্তার কোন অস্তিত্ব নেই। স্রেফ এলোপাথাড়ি বিবর্তনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মের খেলায় মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে। তার ভাষ্যমতে (পৃ. ১২৩):

> Just as people were never created, neither, according to the science of biology, is there a 'Creator' who 'endows' them with anything. There is only a blind evolutionary process, devoid of any purpose, leading to the birth of individuals.

অর্থাৎ, 'মানুষকে যেমন কখনো সৃষ্টি করা হয়নি, ঠিক তেমনি জীববিজ্ঞানের মতে কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই যে-কিনা মানুষকে কোনো সম্মান-মর্যাদা দিয়েছে। বরং সেখানে রয়েছে একটা অন্ধ, উদ্দেশ্যহীন বিবর্তন প্রক্রিয়া, যার ফলে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে।'

মজার বিষয় হলো, এখানে ঘাপলাটা ধরতে আপনাকে খুব বড় কোন দার্শনিক হতে হবে না। বিজ্ঞানের বুনিয়াদি জ্ঞান থাকলেই চলবে। বিজ্ঞান আমাদেরকে ধারণা দেয় এই বিশ্বজগৎ কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে। কিন্তু কেনই বা এভাবে কাজ করে তার উত্তর দিতে পারে না। ফলে দেখা যায় হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের বিখ্যাত ড. ফ্রান্সিস কলিন্স, নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ড. খ্রিশ্চিয়ান দে দুভে'র মতো অনেকেই রয়েছেন যারা বিবর্তন স্বীকার করেন এবং তার সাথে এটাও মনে করেন যে বিবর্তন প্রক্রিয়াটির পেছনে স্রষ্টার হাত রয়েছে, রয়েছে পরিকল্পনার ছাপ। বিবর্তন জাগতিক মেকানিজম ও তার ফলাফল নিয়ে আলাপ করে, সেই মেকানিজমের অন্টোলজি নিয়ে না। এটা দর্শনের জিনিস, বিজ্ঞানের না।

হারারির বক্তব্যটা তো এমন যে স্বয়ং ডারউইনও তার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন! ডারউইন তার জীবনের শুরুর দিকে একজন খ্রিস্টান ছিলেন। এরপর তিনি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে একাত্মবাদীতে (Deist) পরিণত হন, যিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও নির্দিষ্ট কোন ঐশী প্রত্যাদেশ, ঐশী বার্তাবাহক বা ধর্মকে মানতেন না। যখন তিনি 'অরিজিন অফ স্পিসিস' বইটি প্রথম প্রকাশ করেন, তখনও তিনি স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তার বক্তব্য মানুষের কাছে তুলে ধরবার সময় বিবর্তন দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে এমনটা ইঙ্গিত করেননি। শুধু তাই নয়, যারা বিবর্তন দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে ডারউইন জেরা পর্যন্ত করেছেন।[৩] 'অরিজিন অফ স্পিসিস' বইটি প্রথমবার প্রকাশিত হবার পর চার্লস কিংসলি ডারউইনের প্রস্তাবনার ব্যাপারে বলেন[৪]:

> স্রষ্টা যদি এমন কিছু তৈরি করেন যা সময়ের ক্রমে অন্যান্য জীবে রূপান্তরিত হয় - তা ঠিক ততটাই কৃতিত্বের দাবিদার হবে, যতটা হত যদি তিনি সেগুলো সরাসরি তৈরি করতেন।

ডারউইন কিংসলির এই বক্তব্যে এতটাই অভিভূত হন যে তিনি তার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে কথাগুলো সংযুক্ত করে দেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ডারউইনের তত্ত্বের প্রস্তাবনা স্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যাবে, এমনটা তিনি নিজেই মনে করতেন না। বরং সেক্যুলার সমাজের কিছু মানুষ তার এই ধারণাকে ছিনতাই করে তাদের নিজস্ব এজেন্ডার জন্য ব্যবহার করে। 'অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশিত হবার পর অনেকটা সময় ধরে ডারউইন স্রষ্টায় বিশ্বাস করলেও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আস্তিকতা থেকে সংশয়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। সংশয়বাদিরা স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান থাকলেও তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে না।

ডারউইনের এই পরিবর্তনের পিছনে কারণ ছিল তার নিজের জীবনের কিছু দুঃখজনক ঘটনা। স্বাস্থ্যগত সমস্যা, প্রিয় ছেলে ও মেয়ের অল্প বয়সে মৃত্যু এবং আরো নানাবিধ ব্যক্তিগত কষ্টের কারণে তিনি একজন করুণাময় স্রষ্টার ধারণার সাথে পৃথিবিতে বিদ্যমান দুঃখকষ্ট মেলাতে পারছিলেন না। তবে তিনি নিজের এই অবস্থান নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্টও ছিলেন না এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছিলেন। ডারউইনের লেখায় জানা যায়[৫]:

> It seems to me absurd to doubt that a man may be an ardent Theist & an evolutionist. … What my own views may be is a question of no consequence to any one except myself. … In my most extreme fluctuations I have neverbeen an atheist in the sense of denying the existence of a God. I think that generally (& more and more so as I grow older) but not always, that an agnostic would be the most correct description of my state of mind.

অর্থাৎ, 'একজন মানুষ ধর্মপ্রাণ আস্তিক হলেও বিবর্তনতত্ত্ব মেনে নিতে পারে। এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমার মত যা-ই হোক না কেন তার জন্য আমি নিজে ছাড়া আর কেউই দায়ী নয়। .. আমার চিন্তার ওঠানামার চরম ক্ষেত্রেও কখনো আমি স্রষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী নাস্তিক হই নি। আমার মনে হয় বেশীরভাগ সময় সংশয়বাদিতা দ্বারাই আমার চিন্তাধারাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যাবে, যেটার হার আমার বয়স বাড়বার সাথে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।'

ডারউইনের স্রষ্টায় বিশ্বাস নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা এখান থেকে সহজেই অনুমেয়! ডারউইন নিজেই বলেছেন যে, তিনি কখনোই নাস্তিক ছিলেন না। সেই সাথে তার মতে ডারউনবাদের সাথে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সংঘর্ষও ছিল না। বরং ডারউইনের কাছে নাস্তিকতা একটা চরমপন্থি অবস্থান ছিল। তাহলে হারারির জীববিজ্ঞান দ্বারা স্রষ্টার অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণের দাবির কোন অর্থ থাকলো না। হারারি আসলে না বুঝে বিজ্ঞানের সাথে বিশ্বাস গুলিয়ে ফেলেছেন। জীববিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে যারা অ্যাকাডেমিকভাবে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সুপরিচিত একজন হলেন (নাস্তিক) ড. এলিয়ট সোবার। তিনি লিখেছেন[৬]:

> For some people, Newtonian theory and Darwinian theory suggest that there is no God. However, this is not what those theories say. It is a philosophical interpretation that requires additional premises... we should not be astonished, when we discuss science, to find that we are actually doing philosophy.

অর্থাৎ, 'কিছু মানুষ মনে করে নিউটনের তত্ত্ব ও ডারউইনের তত্ত্ব বলে—কোনো পরম স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। অথচ তত্ত্বগুলো মোটেই তা বলে না। তত্ত্বগুলোকে (বিজ্ঞান থেকে) দর্শনে টেনে নিয়ে এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়, যার জন্য আরো প্রেমিস (অনুমান) যোগ করতে হবে। ... বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে যে আমরা অনেক সময় আসলে দর্শন কপচাই এটা অবাক হওয়ার মত ব্যাপার না। মানুষ অধিকাংশ সময়ই এমন করে।'

হারারির বইয়ের ব্যাককাভারে জনরা লেখা পপুলার সায়েনস। কিন্তু উনি সায়েনসের মোড়কে বিকিয়েছেন দর্শন, বস্তুবাদি দর্শন। এমন কাজ নতুন না। বিশ শতকের অনেকেই এই অপরাধে অভিযুক্ত। পদার্থবিদ ড. কে. গিবার্সন এবং পদার্থবিদ ও দার্শনিক ড. এম. আর্টিগাস *Oracles of Science: Celebrity Scienctists versus GOD and RELIGION (Oxford: Oxford University press, 2007)* গ্রন্থে বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় বিজ্ঞানীর বইপত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—এসকল সেলেব্রিটি বিজ্ঞানের নামে এমন এমন কথা বইতে লিখে যা মোটেই বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত না। দর্শনের ছাতার নিচে সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু উপরে লেখা বিজ্ঞান! যাদেরকে এই দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছে তারা হলেন—কার্ল স্যাগান, স্টিফেন যে. গোল্ড, ই.ও. উইলসন, রিচার্ড ডকিনস, স্টিভেন ওয়াইনবার্গ, স্টিফেন হকিং প্রমুখ! গিবার্সন ও আর্টিগাসের ভাষায় (পৃ. ১১):

> Such profoundly oracular—and controversial—utterances [by these celebrity scientists] are what give popular science writing much of its excitement, but such statements are not scientific statements at all. They are philosophical and theological claims cloaked in scientific

> rhetoric, presented on the concluding pages of highly literate books that masterfully open science to broad audiences. But these grand now-here-is-the-point conclusions articulate the personal worldviews of the scientists making the claims, not the implications of the discussion that has preceded them, and certainly not the consensus of the scientific community.

অর্থাৎ, 'সেলিব্রেটি বিজ্ঞানীদের মুখনিঃসৃত এসব দৈববাণী ও বিতর্কিত আলাপগুলোর কারণেই পপুলার সায়েনস বইগুলো মানুষজন এত গিলে। কিন্তু এসকল বক্তব্য বৈজ্ঞানিক নয় মোটেই। বরং এগুলো হলো দর্শন বা ধর্ম কেন্দ্রিক দাবি যা কিনা বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়িয়ে বিকোনো হচ্ছে। আমজনতার কাছে বিজ্ঞানকে উপস্থাপন করার নিয়তে লিখা বইগুলো সেসব মন্তব্যকে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এমন জোরালো বক্তব্য বইগুলোর লিখেছেন যেসব বিজ্ঞানী তাদের নিজস্ব দর্শনের পরিচায়ক, বই জুড়ে আলোচিত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত না, বৈজ্ঞানিক মহলের সামষ্টিক চৈতন্যও না।'

অধ্যাপকদ্বয়ের বই প্রকাশিত হয়েছে হারারির বইয়ের বেশ কয়েক বছর আগে। তখন যদি হারারির বই বাজারে থাকতো তাহলে হারারিকে নিয়েও একটা অধ্যায় আসতো সন্দেহ নেই। সমস্যা হলো আমজনতার বিজ্ঞানচর্চায় উপরে উল্লেখিত নামগুলো একবাক্যে অথরিটি হিসেবে মানা হয়। ফলে তারা যে আসলে বিজ্ঞানের খোলসে বিশ্বাস, দর্শনও প্রচার করেন এটা কেউই বুঝতে পারে না। বিজ্ঞানের সাথে জুড়ে দেয়া বাড়তি দর্শনকেও বিজ্ঞানের মত মনে করে। জড়িয়ে যায় বিজ্ঞানবাদে। তাই যখন নিখাদ বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবাদের তফাৎ তাদের জানানো হয়, তারা সেই বাস্তবতা মানতে পারে না।

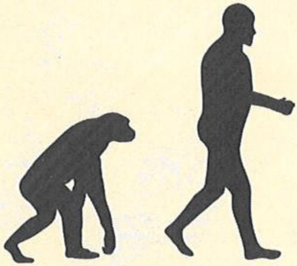

হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস

মানুষের উৎপত্তি কোথা থেকে হলো—এই প্রশ্নে হারারি বিজ্ঞানের দারস্ত হয়েছেন। বিবর্তনকে তিনি কোনো প্রশ্ন করেন নি, 'সমস্ত কথায় অনায়াসে সম্মতি' দিয়েছেন। মানুষ এসেছে নিচু শ্রেণির কোনো প্রাণী থেকে, যা দেখতে সম্ভবত শিম্পাঞ্জির মত ছিল। তাদের থেকে এসে মানুষ-শিম্পাঞ্জি ভাই ভাই, তবে পথটা একটু আলাদা সাঁই! কিন্তু আমি 'বুদ্ধির নখে শান' দিতে গিয়ে দেখলাম, মানব বিবর্তনের নানা দিক নিয়ে বিবর্তনপন্থিদের মাঝে নানারঙা তর্কবিতর্ক আছে। যেমন, নামকরা ফসিলবিদ প্রফেসর বার্নার্ড উড *নেচার* জার্নালে বলেছেন[৭]:

> গত পঞ্চাশ বছর ধরে সংগৃহীত ফসিল-প্রমাণ এবং বিশ্লেষণ-প্রযুক্তি কাজে লাগানোর পরও [অস্ট্রালোপিথ থেকে] কীভাবে হোমো আসলো—এই প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি।

শ্রীমতী আর্নেস্ট মায়ারও বেশ কয়েকবছর আগে একই কথা বলেছিলেন তার *What Makes Biology Unique? (Cambridge University Press, 2004)* বইতে। মানবের অনুমিত ফসিল ক্রম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন (পৃ. ১৯৮):

মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝে ব্যাপক মিল শুনে শুনে আমরা ক্লান্ত। আসলেই কি আমরা এতটা মিলসম্পন্ন?

> অস্ট্রালোপিথিকাস ও হোমো গণের গোড়ার দিকের ফসিলের মাঝে বিশাল শূন্যস্থান দেখা যায়। এ দুইয়ের মাঝে সংযোগকারী কিছু নেই।

এদিকে ফসিলে সংযোগহীনতার বেদনাদায়ি বিচ্ছিন্নতার সাথে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে জেঁকে বসেছে পপুলেশান জেনেটিক্সের জটিল হিসেব। প্রচলিত ধারণায় অস্ট্রালোপিথিকাস থেকে হোমো গণ এসেছে প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু পপুলেশান জেনেটিক্সের ছকে মানুষের পপুলেশন সাইজ, মিউটেশনের হার ইত্যাদি হিসেব করে দেখা গেছে অস্ট্রালোপিথিকাস থেকে হোমো আসা দূরকল্পনা! কপালফেরে মাত্র ৮টা উপকারী মিউটেশন হয়ে পপুলেশনে স্থির হতে যে সময় লাগে তা মহাবিশ্বের বয়সের চেয়েও ৪০০ কোটি বছর বেশি হয়ে যায়![৮] অথচ মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমে শুধু কোডিং এলাকাতেই প্রায় ৪ কোটি নিউক্লিওটাইড ভিন্ন! জিনোমের

বাকি ৯৮ ভাগ না-হয় বাদই দিলাম। হারারি এত ভেতরে যান নি। দ্ব্যর্থভাবে বলেছেন, আমরা শিম্পাঞ্জির সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপুর্ণ। মানব বিবর্তনের সাথে জড়িত অতি পরিচিত আলাপ এটা। জিনগত পর্যায়ে মানুষ আর শিম্পাঞ্জি প্রায় ৯৮-৯৯% একই—এমন কথা বিবর্তনভক্তদের স্টেপল ফুড। হারারি বলেছেন এত মিল থাকার ব্যাপারটা বিব্রতকর, আমরা 'embarrassingly similar to chimpanzees' (পৃ. ৪২):

> [H]omo sapiens and human culture [are not] exempt fom biological laws. We are still animals, and our physical, emotional and cognitive abilities are still shaped by our DNA. Our societies are built from the same building blocks as Neanderthal or chimpanzee societies, and the more we examine these building blocks - sensations, emotions, family ties - the less difference we find between us and other apes. It is, however, a mistake to look for the differences at the level of the individual or the family. One on one, even ten on ten, we are embarrassingly similar to chimpanzees.

অর্থাৎ, 'হোমো স্যাপিয়েন্স এবং তাদের সংস্কৃতি জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুনের বাইরে না। যতকিছুই হোক, দিনশেষে আমরাও কেবল পশু এবং আমাদের শারীরিক, আবেগী ও বুদ্ধিভিত্তিক দক্ষতা ডিএনএ নির্ধারণ করে দেয়। আমাদের সমাজের গঠনগত উপাদান এবং নিয়ান্ডার্থাল বা শিম্পাঞ্জিদের সমাজের গঠনগত উপাদানের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই। যতই বেশি আমরা এসব গঠনগত উপাদান সম্পর্কে জানব, ততই এ কথা আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে, অনুভূতি, আবেগ এবং পারিবারিক বন্ধনের কথা

বিবেচনা করলে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য বানর জাতীয় পশুর তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সে কারণে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গঞ্জিতে অন্যান্য নরবানরের প্রজাতির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য খুঁজতে যাওয়াটা একরকম বোকামি। একজন মানুষের সাথে একটা শিম্পাঞ্জি, এমনকি দশজন মানুষের সাথে দশটা শিম্পাঞ্জি পাশাপাশি রাখলে, আমাদের মাঝে মিল দেখতে পেয়ে আমরা নির্ঘাত লজ্জা পেয়ে যাব।'

কিন্তু বাস্তবে আমরা যখন মানবশিশু আর শিম্পাঞ্জির মাঝে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঘেঁটে দেখি, তখন এদুয়ের মাঝে ফারাক খুব প্রকটভাবে চোখে আসে! তাছাড়া এই ১% মিলের ব্যাপারটাও এত সোজাসাপটা না। প্রাণিবিদ প্যাসকেল বলেন, ১% পার্থক্য দিয়ে মানুষ ও শিম্পাঞ্জিকে বোঝার চেষ্টা করা বড় রকমের বাধা! হারানো DNA, অতিরিক্ত জিন, জিন নেটওয়ার্কে ভিন্ন কানেকশন, ক্রোমোসোমের স্বতন্ত্র গঠন—ইত্যাদি কারণে মানুষ-শিম্পাঞ্জি পার্থক্য নিরূপণ বানচাল হয়ে যাচ্ছে! *সায়েনস* জার্নালের এক প্রতিবেদনে জিনবিদ ভ্যান্তে পাভো বলেন[৯]:

> আমার মনে হয় কোনোভাবেই এই মিল-অমিলের ব্যাপারে সংখ্যা নির্ধারণ সম্ভব না। সত্যি বলতে কী, এই পার্থক্যের বিষয়টা আসলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপার।

হারারিও কী এই রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্রোতে গা ভাসিয়েছেন? চিন্তাশীল পাঠক এর উত্তর খুঁজবেন হয়ত।

এমআইটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *Why We Co-operate (2009)* গ্রন্থে মিশেল টমাশেলো'র গবেষণা থেকে দেখা যায়, মাত্র ১-২ বছরের বাচ্চার সাথেও শিম্পাঞ্জির ব্যবহার ও সহযোগিতার মাঝে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি কথা বলার ক্ষমতা আসার আগেই মানবশিশু একেবারে অপরিচিত মানুষকেও হাতের ইশারায় ইঙ্গিত করে তথ্য বিনিময় করতে পারে, যার ধারেকাছেও শিম্পাঞ্জি আসতে পারে নি। ড. মিশেলের পর্যবেক্ষণ জানায় (পৃ. ১১-১২):

> No animal species other than humans has been observed to have anything even vaguely resembling [social institutions]

অর্থাৎ, 'মানুষ ছাড়া আর কোনো পশুপাখির মাঝে এমন সামাজিক ব্যবস্থার নজির দেখা যায় না।'

কিন্তু হারারি মনে করেন আমাদের সামাজিক আচার আর শিম্পাঞ্জির আচার প্রায় একই! অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *Not A Chimp (2009)* গ্রন্থে জেরেমি টেইলর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা একাট্টা করে ব্যাপক আলোচনায় দেখিয়েছেন শিম্পাঞ্জি আর মানুষ অনেক আলাদা। এদের নিয়ে প্রচলিত টিভি নিউজ আর পপুলার বইপত্র ভুলে ঠাসা। তিনি বলেন (পৃ. ২৮৭):

> Our relationship with the chimpanzee is in need of drastic revision. It has become dysfunctional thanks to a staple diet of popular science articles and television programmes about chimps, and the other great apes, which take a simplistic view of the science available to us and use it to stress their 'extraordinary' similarity to us, in terms of both genetics and cognition, often with the active connivance of senior figures in the world of primatology, who should know better... The cuddlesome 'chimps are us' image is as misguided, wrong, and morally and intellectually bankrupt ... and are now, thankfully, consigned to the dustbin

অর্থাৎ, 'শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের সাদৃশ্যের প্রচলিত ধারণার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক পর্যায়ে

গিয়ে ঠেকেছে। শিম্পাঞ্জি ও অন্যান্য বানরের ব্যাপারে প্রচলিত বিজ্ঞান বিষয়ক মুখরোচক রচনা ও টেলিভিশন প্রোগ্রামের কল্যাণে এই ধারণার বহুল প্রসার। এরা বিজ্ঞানের একটা (বিকৃত) সোজাসাপটা রূপ বেছে নিয়ে এর দ্বারা শিম্পাঞ্জীর সাথে আমাদের অদ্ভুত মিলের বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। জিনগত বা ধীশক্তি দুই ক্ষেত্রেই মিল খুঁজতে এরা বদ্ধপরিকর। প্রায়ই দেখা যায় এরা প্রাইমেটোলজির পণ্ডিতদের মৌন সমর্থন মন্তব্যরূপে জুড়ে দেয়; অথচ এই বিশেষজ্ঞদের আরো গভীরভাবে (পার্থক্যের) ব্যাপারটা জানা থাকার কথা।... আমরা আসলেই শিম্পাঞ্জিই-এমন আদুরে কথাবার্তা বিভ্রান্তিকর, ভুল; বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দিক থেকেও দেউলিয়া কথা... এসব ডাস্টবিনে ফেলে দেয়ার সময় হয়ে গেছে...'

এই বিষয়গুলো পড়া না থাকায় হারারি প্রচলিত ভুলেই নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। অথবা পড়া থাকলেও হয়তো নাস্তিক্যবাদি ইতিহাস লেখার স্বার্থে এড়িয়ে গেছেন। বিবর্তনতত্ত্বের প্রতি অটুট আস্থা সেক্যুলার সমাজের মূলমন্ত্র। একে প্রশ্ন করলেই তাকে অচ্ছুত ঘোষণা করা হয় অ্যাকাডেমিয়াতে, সমাজে। কে নিজের ক্যারিয়ারকে হুমকির মুখে ফেলে এসব নিয়ে মুক্তচিন্তা করতে যাবে?

বিবর্তনের চোখে মানুষ স্রেফ পশু। মোটেই জটিল নয় কোনো ব্যাকটেরিয়ার থেকে, বরং ব্যাকটেরিয়া বিবর্তনে নজরে মানুষের চেয়েও সফল। নিজেকে স্রেফ পশু হিসেবে বিবেচনা করে লেখা ইতিহাসে মানুষের ক্রুদ্ধ আচরণ নিয়ে বলতে গিয়ে হারারি বলেছেন (পৃ. ১৩):

> Having so recently been one of the underdogs of the savannah, we are full of fears and anxieties over our position, which makes us doubly cruel and dangerous. Many historical

> calamities, from deadly wars to ecological catastrophes, have resulted from this over-hasty jump.

অর্থাৎ, 'স্যাপিয়েন্স ছিল অনেকটা ভুইফোঁড় একনায়ক। ক'দিন আগেই তৃণভূমিতে চরে বেড়ানো এক মামুলি প্রাণী থেকে হঠাৎ শীর্ষে ওঠার ফলে আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ভয় আর উৎকণ্ঠা কাজ করত নিজেদের অবস্থান হারানোর কথা ভেবে। এই অনিশ্চয়তা আমাদের আরো নৃশংস ও ভয়ংকর করে তুলেছে। ভয়ংকর যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ইতিহাসের বড়ো বড়ো বিপর্যয়ের অনেকগুলোই সংঘটিত হয়েছে মূলত খাদ্যচক্রে মানুষের এই অপ্রত্যাশিত লাফের কারণে।'

হারারির মতে, আমাদের এই আচরণের কারণ আমাদের বনজঙ্গলে বসবাসের পূর্ব অভিজ্ঞতার সামষ্টিক চৈতন্য। কিন্তু এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ হলপাইক বলেন[১০]:

> No, we're not full of fears and anxieties about our position in the food chain, and never have been, because a species is not a person who can remember things like having been the underdog of the savannah tens of millennia in the past. Knowledge of our life on the savannah has only been vaguely reconstructed by archaeologists and anthropologists in modern times.

অর্থাৎ, 'একদমই না, খাদ্য শৃঙ্খলে আমাদের অবস্থান নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন ভয়ভীতি নেই এবং তা কখনোই ছিল না। কারণ একটা প্রজাতি কোনো (চেতনা ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন) ব্যক্তিবিশেষ নয় যে তৃণভূমিতে তার বহু শতকের লাঞ্ছনার কথা মনে রাখতে পারবে। তাছাড়া তৃণভূমিতে তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রার খুব কম অংশই

প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদেরা উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন।'

একটা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে তাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে কতটুকুই বা ধারণা করা যায়? কঙ্কাল দেখে মানুষের মনের অনুভূতির কথা কি আদৌ পড়া সম্ভব যেখানে মানুষের মনস্তত্ত্বের বড় একটা অংশ আমাদের এখনো অজানা? তা হলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হারারি তাত্ত্বিক দিক থেকে তার কোন ব্যাপারে কথা বলবার সীমানা পার করে ফেলেছেন। যদি তখনকার মানুষের মধ্যে ধর্ম নিয়ে ভাবনার উৎপত্তির ব্যাপারে কিছু বলতেই হয়, তা হলে অন্তত তাদের মনের মধ্যে কী চলছিল তা সম্পর্কে জানতে হবে। এই সুযোগটা আমাদের হাতে নেই।

আমাদের হাতে যে প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ আছে তা দিয়ে আমরা তাদের শরীরের গঠন সম্পর্কে কিছু বলতে পারলেও তাদের চিন্তাধারা নিয়ে জোরাল কিছু বলার অধিকার আমাদের নেই। এ ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতা শুধু ধারণা করবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এখানে তিনি আরো একটা ভুল করেছেন, যা বিবর্তন নিয়ে ভালো পড়াশোনা আছে এমন কারো করবার কথা নয়! তিনি প্রজাতির নিজস্ব স্মৃতি আছে বলে ধরে নিচ্ছেন, বিবর্তন কিংবা সাধারণ যুক্তির সাথে যা কোনভাবেই যায় না।

প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি নয় যা কালের পরিক্রমায় ঘটে যাওয়া নানাবিধ বিষয় সংরক্ষণ করে রেখে পরবর্তী বংশধরদের কাছে তা পৌঁছে দেবে এবং ভবিষ্যতে তাদের করণীয় কী এ সম্পর্কে তাদের উপদেশ দেবে। বাস্তবতা অ্যাসাসিন'স ক্রিডের মত কোন গেম নয় যে সামান্য কিছু ডিএনএ'র টুকরো পেলে তা দিয়েই আমরা অতীতে ঘুরে আসতে পারবো। এগুলো সব লাগামছাড়া কল্পনা। এভাবে মানবের প্রকৃতি নিয়ে জল্পনায় লিপ্ত হলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তারওপর সুদূর ভবিষ্যতে মানবতার কী হবে সে কল্পনা বাস্তবতার ধারে কাছেও যাবে না তা বলাই বাহুল্য।

এর পরেও হারারি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই স্যাপিয়েনস ও তার আরেকটি বই *হোমো ডিয়াসে* মানবজাতির গতিপথ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যে ভাবনা শুরু হয়েছে গলদ দিয়ে সেটার ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ছুড়লে অবস্থা আরো বেগতিক হবে। নামকরা নিউরোসায়েন্টিস্ট এন্তনিও দ্যামাসিও তো বলেই ফেলেছেন এক্ষেত্রে[১১] :

> হারারির অনুমানগুলো বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভালো না, এবং তার সিদ্ধান্ত একেবারেই গলদ!

নৈতিকতায় নায়েলিজম

মানুষের অস্তিত্বের আবশ্যিক অংশ হলো ভালো-মন্দের অস্তিত্বের অনুভূতি। পশুপাখির জগতে এর দেখা আমরা পাই না। পাই মানুষে। মানবাধিকার-নৈতিকতার স্বরূপ নিয়ে হারারির বক্তব্য হল (পৃ. ৩১, ১২৩):

> There are no gods in the universe, no nations, no money, no human rights, no laws, and no justice outside the common imagination of human beings... Equally, there are no such things as rights in biology. There are only organs, abilities and characteristics. Birds fly not because they have a right to fly, but because they have wings.

অর্থাৎ, 'মানুষের কল্পনার বাইরে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, জাতি, অর্থ, মানবাধিকার, আইন ও ন্যায়ের কোন অস্তিত্বই নেই।... একইভাবে জীববিজ্ঞানের ভাষায় অধিকার বলতে কিছু নেই, শুধু অঙ্গ, শক্তি-সামর্থ্য আর বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। উড়বার অধিকার রয়েছে বলে পাখিরা উড়ে না, বরং ডানা আছে বলেই তারা উড়তে পারে।'

পপুলার সায়েনস বইতে কট্টর বস্তুবাদি দর্শন! হারারি এখানে যে দার্শনিক অবস্থান বেছে নিয়েছেন তা হলো মোরাল নায়েলিজম বা নৈতিকতার অনস্তিত্ব মতবাদ। এ মতবাদে নৈতিকতার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এসবই মানব কল্পনা। ভালো আর মন্দের মাঝে কোনো ফারাক নেই। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা এসবই ফিকশান, কল্পনা। তবে নাস্তিকতা এবং বিবর্তনীয় নৈতিকতা যে নৈতিকতার বাস্তব অস্তিত্বকে (moral realism) অসম্ভব করে তোলে এইদিক আলোচনা করায় উনাকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার। (নাস্তিক) দার্শনিক থমাস নাগেলের ভাষায় বললে[১২]:

> [A]n evolutionary self-understanding would almost certainly require us to give up moral realism—the natural conviction that our moral judgments are true or false independent of our beliefs. Evolutionary naturalism implies that we shouldn't take any of our convictions seriously, including the scientific world picture on which evolutionary naturalism itself depends.

অর্থাৎ, 'বিবর্তনের আঁচড়ে আমাদের চিত্র আঁকলে—ভালো-মন্দের বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব আছে—এই বিশ্বাস আমাদের ত্যাগ করতে হবে। পাশাপাশি বিবর্তনীয় বস্তুবাদে আমাদের যুক্তিবুদ্ধিকেও আমলে নেয়ার নেয়ার ভিত্তি থাকে না। ফলে বিজ্ঞানের ভিত্তিতেও নড়বড়ে হয়ে পড়ে; যার ওপর বিবর্তনীয় বস্তুবাদ স্বয়ং ভিত্তিশীল বলে দাবি করে।'

মানবাধিকার প্রসঙ্গে হারারি আবার জীববিজ্ঞানকে টেনে এনেছেন। একথা সঠিক যে অধিকার, নৈতিকতা এসব অবৈজ্ঞানিক ধারণা; কারণ এসব হলো ভ্যালু জাজমেন্ট, বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করা যায় না। তাই বলে বিজ্ঞানের নাগালে না থাকা জিনিসকে অস্তিত্বহীন

বলে ফেলা অবুঝের আচরণ। এ পর্যায়ে সোশিও-বায়োলজি, বা পরে যেটাকে ইভোলিউশনারি সাইকোলজি বলা হয় তা নিয়ে কেউ কথা তুলতে পারেন। বিবর্তনকে পূঁজি করে বিজ্ঞানভক্তদের দেখা যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন আর খাপ খাইয়ে নেয়ার চশমা দিয়ে মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করতে উঠে পড়ে লাগছে। অ্যাকাডেমিকরা এ বিষয়ে যখন কথা বলেন তারা মূলত অনুমান হিসেবে বলেন, কিন্তু বিভিন্ন ভুঁইফোড় বিজ্ঞান গ্রুপ বা বইপত্রে সেগুলোকে বাস্তবতা বলে চালানো হয়! কিন্তু এই বদঅভ্যেসের ব্যাপারে সতর্কবাণী পাওয়া যায় (নাস্তিক) দার্শনিক ফিলিপ কিচারের জবানীতে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *The Ethical Project (2011)* গ্রন্থে তিনি বলেন (পৃ ১০-১১):

> [E]volutionary explanations . . . run the risk of becoming exercises in storytelling—just-so stories without Kipling's wit. After all, reconstructing the actual history of the ethical project, from its beginnings to the present, is plainly beyond the evidence available—and probably beyond the evidence anyone could ever hope to obtain

অর্থাৎ, '(মানব নৈতিকতা ও আচরণ নিয়ে) বিবর্তনকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের শিশুতোষ গল্পের মত অপ্রমাণ্য হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। আসলে মানব নৈতিকতার শুরু থেকে ইতিহাস সাজাতে চাইলে আমাদের হাতে থাকা প্রমাণ অপ্রতুল। যা বলা হবে সবই প্রমাণ ছাপিয়ে যাওয়া আলাপ। এসবের প্রমাণ পাওয়া সম্ভবও না।'

(নাস্তিক) দার্শনিক জন ডুপ্রে'র দৃষ্টিতে মানবাচরণের বিবর্তনকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা মূলত, 'মানবাচরণ অনুধাবনের পথে একটি

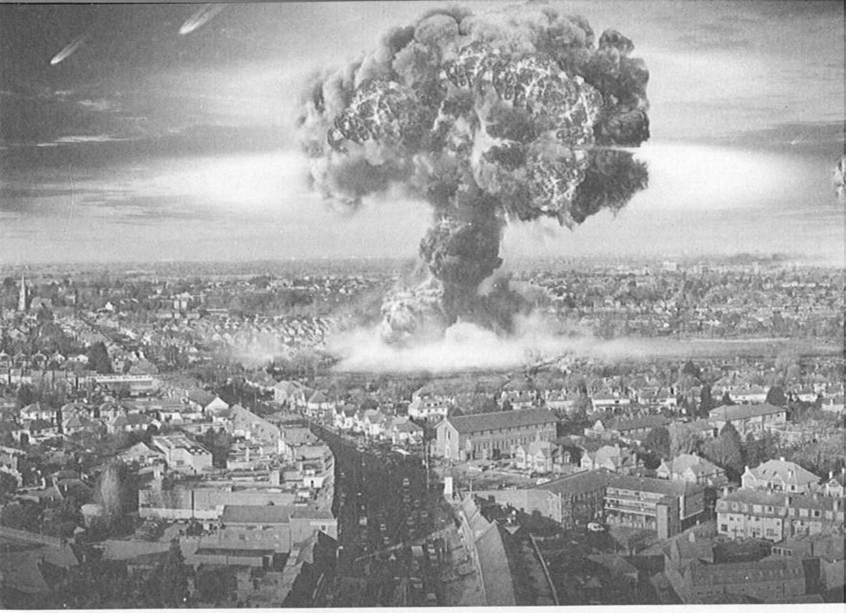

মানবতার প্রতি প্রগতিবাদীদের উপহার।
অজস্র ধ্বংস, মৃত্যুর পরোয়ানা-আণবিক বোম।
ছবিটি প্রতিকী।

দেউলিয়া পদ্ধতি। বিবর্তনবিদ্যা থেকে উঠে আসা ব্যর্থ বিজ্ঞানবাদি পদক্ষেপ'![১৩] তার ভাষায়:

> [E]volutionary psychology is, nevertheless, a largely bankrupt approach to understanding human behaviour... Evolutionary psychology can be seen as a failed imperialistic adventure from evolutionary biology.

তবে হারারি এত জটিলতার দিকে যান নি। পপুলার মুখরোচক গল্প লিখতে গেলে এত জটিল চিন্তা করা সাজে না। তবে একটা মজার ব্যাপার হল আমরা যদি হারারির কথামতো মোরাল নায়েলিজমের দিকে যেতে চাই, তা হলে তার বইয়ের থাকা নৈতিকতার কড়চা মেনে

নেবার কোন দরকার থাকে না। যে নিজেই নৈতিকতাকে অস্তিত্বহীন বলে উড়িয়ে দিচ্ছে, সেই আবার বই লিখে অমুক কাজ ন্যায় বা তমুক কাজ অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করছে! একই সাথে সুশীল, প্রগতিশীল সমাজের বেদবাক্য লিবারেলিজম, হিউম্যানিজম, সোশিয়ালিজম এসবকে হারারি খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মের মতই ধর্ম হিসেবে গণ্য করেছেন! তফাত হলো ইসলাম বা খ্রিস্টানধর্মে উপাসনা হয় এক অতিপ্রাকৃত উপাস্যের। কিন্তু লিবারেল ধর্মে পুজা করা হয় মানুষকে, মনুষ্যত্বকে (পৃ. ২৫৪):

> The last 300 years are ofen depicted as an age of growing secularism, in which religions have increasingly lost their importance. If we are talking about theist religions, this is largely correct. But if we take into consideration natural-law religions, then modernity turns out to be an age of intense religious fervour, unparalleled missionary efforts, and the bloodiest wars of religion in history. The modern age has witnessed the rise of a number of new natural-law religions, such as liberalism, Communism, capitalism, nationalism and Nazism. Tese creeds do not like to be called religions, and refer to themselves as ideologies. But this is just a semantic exercise. If a religion is a system of human norms and values that is founded on belief in a superhuman order, then Soviet Communism was no less a religion than Islam.

অর্থাৎ, ‘বিগত তিনশ বছরকে ক্রমবর্ধমান ধর্মহীনতার (সেকুলার) যুগ হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। ঈশ্বরের ধারণা আছে যেসব ধর্মে,

এই সময়ের মাঝে ক্রমশই সেগুলোর গুরুত্ব কমেছে বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য যেসব জাগতিক ধর্ম আছে—সেগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। গত কয়েক শতাব্দীতে "আধুনিকতা" যুগিয়েছে তীব্র ধর্মীয় উন্মাদনার স্বাদ; পেয়েছে একচেটিয়া প্রচার-প্রসার আর ঘটিয়েছে ইতিহাসের কয়েকটি ভয়ঙ্করতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই সময়ে যেসব জাগতিক ধর্ম মাথা তুলেছে তাদের মধ্যে আছে লিবারেলিজম, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ ও নাৎসীবাদের মতো ধ্যান-ধারণা। অনেকে এগুলোকে ধর্ম বলতে চান না, বরং মতাদর্শ হিসেবে দেখতে চান—আদতে এগুলা স্রেফ শব্দের খেলা। যদি ধর্মকে আমরা "মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনো শক্তিতে বিশ্বাস রেখে মানুষের পালিত আচার-আচরণ" বলে সংজ্ঞায়িত করি—তাহলে ধর্ম হিসেবে সোভিয়েত সাম্যবাদ ইসলামের চেয়ে কোনোভাবেই কম যায় না।'

কথাটা তিনি ভুল বলেন নি। এটাও স্বীকার করেছেন আধুনিকতা আর প্রগতির নামে কত ভয়ানক সহিংসতা সঙ্ঘটিত হয়েছে আসছে—এদুয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সহিংসতা! কিন্তু বিষয়ে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেন নি। মুক্তি ও স্বাধীনতার ধ্বজাধারীদের গিলোটিনের নিচে মানবতা কতটা নির্মমতার সাথে জবাই হয়েছে তার উল্লেখ নেই! কলোনিয়াল কালের হত্যাকাণ্ড যদি বাদও দেই, তারপরও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিগত ষাট বছরে সারা দুনিয়াতে প্রায় ৫-৫.৫ কোটি মানুষ মারা গেছে পশ্চিমের আলোকপ্রাপ্ত লিবারেল উপনিবেশবাদ আর নয়া-উপনিবেশবাদী তৎপরতায়! এই অল্প সময়ের মধ্যেই মানব সভ্যতা ইতিহাসের সবচাইতে ভয়াবহ কিছু গণহত্যা দেখেছে। পরোক্ষ হিসেবে আরও কয়েক কোটি মানুষ নিহত হয়েছে পশ্চিমা শক্তিগুলোর সহায়তায় স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ আর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এই গণহত্যাকাণ্ড অধিকাংশ ঘটেছে চরম নিষ্ঠুরতায় আর নীরবে। যুদ্ধ আর মানুষ হত্যার এসকল পরিকল্পিত আয়োজনগুলোকে খুব কম সময়েই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে পশ্চিমা দুনিয়ায় ও

তাদের ভাবশীষ্যদের চিন্তায়। এমনকি দখলকৃত ভূমিতেও এসকল হত্যাকাণ্ডকে মেনে নেয়া হয়েছে প্রায় বিনা প্রতিবাদে। এসবের বেশিরভাগই সংগঠিত হয়েছে দুটি সস্তা শ্লোগানের ওপর ভর করে—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা। অথচ এসকল ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে প্রগতিশীলদের মাঝে দেখা যায় এক নিদারুণ অজ্ঞতা আর ভুল তথ্যসমৃদ্ধ বোঝাপড়া।[১৪] লিবারেল সমাজের ভিত্তিমূলে থাকা অন্যতম মিথ হলো—ধর্ম মজ্জাগতভাবে সহিংসতার আকর। অথচ অ্যাকাডেমিক গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে—জঙ্গিবাদের মূল কারণ ধর্ম নয়। ধর্মের চেয়ে বরং রাজনীতি বেশি প্রভাব রাখে।[১৫] জানা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে অধিকাংশ যুদ্ধই হয়েছে জাগতিক স্বার্থের উস্কানিতে। *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার* অনুযায়ী মানব ইতিহাসে সংঘটিত হওয়া ১৭৬৩টি যুদ্ধের মাত্র ১২৩টি ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল। অর্থাৎ মাত্র ৭ শতাংশ! দেশের লিবারেল গোষ্ঠী উদাত্তভাবে হারারির বই পড়ার জন্য আহ্বান করে। কিন্তু হারারি যে তাদেরকে ধার্মিক বলেছেন, লিবারেলিজমকে ধর্ম বলেছেন, আধুনিকতাকে সহিংস বলেছেন—এসব তারা আদৌ জানে?

জীববিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, নৈতিকতা, মানবাধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা নেই এটা দার্শনিক প্রস্তাবনা, বিজ্ঞানের না। এমন দাবি করতে হলে সাথে আরো যেসব বিশ্বাস বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করা হয়েছে যেমন—বস্তুবাদ, আবদ্ধ কার্যকারণ—কেন হারারি এসব যৌক্তিক মনে করেন সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু হারারি তা করেন নি, কেবল মতটা উল্লেখ করেই চলে গেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি জীববিজ্ঞান ও বস্তুবাদি দর্শনকে একসাথে মিশিয়ে জগাখিচুড়ি বানিয়েছেন! প্রসঙ্গত, ইসলামের ক্ল্যাসিক্যাল অবস্থান থেকে দেখলে বিবর্তনের কতটুকু গ্রহণ বা প্রশ্ন করা যায় সেটা বিস্তারিত অ্যাকাডেমিক আলোচনার বিষয়। আজকের আসরে সেটা সম্ভব না।

বিপ্লবে ভজঘট

ইউরোসেন্ট্রিক নৃতত্ত্বে উৎকর্ষের মানদণ্ড ছিল সাদা প্রভুরা। তাই নিজেদের সাথে যা মিলেনি তাকে আদিম, অসভ্য বলাতে তাদের কুণ্ঠাবোধ হয় নি। উনিশ শতকের ইউরোপিয় জীবনব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে প্রাচীন মানুষ ছিল নেহায়েতই বুনো, ভাবল তারা। কিন্তু গুহাচিত্র তাদের যে আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যের দেখা মিলেছিল তা অবাক করেছিল সভ্যদের! তাদের চিত্রকর্ম দেখে পিকাসো বলেছিলেন- আমরা আর কি ছবি আঁকব, যা আঁকার তা তো তুষারযুগের মানুষেরাই এঁকে গেছে। তাদের গুহাচিত্রের গভীর জটিলতার কাছে আধুনিক মানুষের কোন শিল্পকর্ম দাঁড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ।

এই আশ্চর্য জটিল গুহাচিত্রগুলো যে আসলেই আদিম মানুষের করা, সেটা হজম করতে ইউরোপিয়দের বেশ বেগ পেতে হল। হয়ত আধুনিক কালেরই কোন চিত্রকর্ম বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মানুষের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছেন—এ ধরণের একটা সন্দেহের কথা উঠাতে লাগলেন কেউ কেউ। তবে এই সন্দেহ বেশিদিন টিকল না। কারণ পৃথিবীময় একের পর এক গুহার মধ্যে এ ধরণের শিল্পকর্ম আবিষ্কার হওয়া শুরু করল। এর থেকে আমাদের বুঝে আসলো একজন সাংঘাতিক জটিল,

আদিম গুহাচিত্র।

অগ্রসর মনস্তত্ত্বের মানুষও খুব আদিম জীবনব্যবস্থা নিয়ে চলতে পারেন। এই বিশ ত্রিশ হাজার বছর আগের মানুষদের ঘরবাড়ি খেত ছিল না, কিন্তু তাদের চিত্রকর্ম ছিল মোনালিসা পর্যায়ের। আর তাদের ভাবনার জগতটা জুড়ে ছিল অসামান্য জটিলতা। একটি জাতির বাহ্যিক সংস্কৃতি দিয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থাকে যাচাই করা যায় না। অর্থাৎ স্থাপত্য, পয়ঃনিষ্কাশন বা গণিতবিদ্যাই মানুষের মানসিক অগ্রসরতার একমাত্র পরিচায়ক নয়। নেটিভ আমেরিকার আদিবাসীদের সাথে ইউরোপের বিজ্ঞানচিন্তার তুলনা এর একটি ছোট্ট উদাহরণ।[১৬]

অথচ হারারি তার বইতে ঠিক উল্টো কাজটাই করেছেন। আমাদের চোখে মনে হওয়া আদিম জীবনব্যবস্থায় চলা মানুষগুলো মানসিকভাবেও আদিম বানিয়ে দিয়েছেন। কগনিটিভ রেভ্যুলিউশান

নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হারারি মানব ভাষা নিয়ে আলাপ করেছেন। যদিও কিভাবে এর উদ্ভব তা নিশ্চিত না এই বাস্তবতা হারারি স্বীকার করেছেন। এরপর কিভাবে মুখের ভাষা, কথা বলার ক্ষমতা উৎপন্ন হলো তা নিয়েও কথা এসেছে। তিনি বলেছেন (পৃ. ২৩):

> The appearance of new ways of thinking and communicating, between 70,000 and 30,000 years ago, constitutes the Cognitive Revolution. What caused it? We're not sure. The most commonly believed theory argues that accidental genetic mutations changed the inner wiring of the brains of Sapiens, enabling them to think in unprecedented ways and to communicate using an altogether new type of language. We might call it the Tree of Knowledge mutation.

অর্থাৎ, 'স্যাপিয়েনসদের বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব-এর কারণ হিসেবে সবচেয়ে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মোটামুটি ৭০ হাজার বছর আগে স্যাপিয়েন্সদের জিনে কোনো আকস্মিক পরিব্যক্তি (mutation) তাদের মস্তিষ্কের নিউরনের মধ্যে সংযোগের পদ্ধতি পাল্টে দেয়। ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে আরো সার্থকভাবে যোগাযোগ করার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষা আয়ত্ত করতে পারে । আমরা এই রূপান্তরের নাম দিতে পারি-জ্ঞান বৃক্ষের রূপান্তর!'

আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও ব্যাপারটা এত সোজাসাপটা না। এই ফিল্ডে পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক আছে এ নিয়ে। ২০০০ সালে স্যালি ম্যাকবার্থি ও এলিসন ব্রুকস মিউটেশান হয়ে আচমকা বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন। বহুল আলোচিত সেই গবেষণাপত্রে লেখকদ্বয় বলেন, আরো হাজার হাজার বছর আগেও মানবের ক্রমবর্ধান বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার আলামত

মেলে। কিন্তু ভুলবশত এসব প্রমাণ গণ্য করা হয়নি। আচমকা বিপ্লবের চেয়ে নতুন আচার আচরণ বিভিন্ন জায়গায় ক্রম-আবির্ভূত হতে দেখা যায়, যেসব যায়গা একে অপরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। ম্যাকবার্থি-ব্রুকসের গবেষণাপত্র পণ্ডিতদের মাঝে এমন বিতর্কের জন্ম দেয় যা আজও মেটেনি।[১৭]

ভাষার উদ্ভব নিয়ে আরেক ব্যাখ্যা সম্পর্কে হারারি বলেছেন (পৃ. ২৫-২৬):

> Our language evolved as a way of gossiping. According to this theory Homo sapiens is primarily a social animal... The new linguistic skills that modern Sapiens acquired about seventy millennia ago enabled them to gossip for hours on end. Reliable information about who could be trusted meant that small bands could expand into larger bands, and Sapiens could develop tighter and more sophisticated types of cooperation.

অর্থাৎ, 'আমাদের ভাষার উদ্ভব হয়েছে মূলত নিজেদের নিয়ে গল্প করার, আড্ডাবাজি করার এমনকি নিন্দা করার উপায় হিসেবে। এই তত্ত্বানুসারে মানুষ মূলত সামাজিক জীব। ... নতুন ধরনের ভাষা - যেটা স্যাপিয়েনসরা মোটামুটি ৭০ হাজার বছর আগে রপ্ত করতে পেরেছিল, এই ভাষা তাদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করার একটা সুযোগ করে দিল। এই বুদ্ধি ছোটো ছোটো মানবগোষ্ঠীকে বড়ো বড়ো মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দিল। স্যাপিয়েনস তার ফলে আরো সঠিকভাবে আরো জটিল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হলো।'

কিন্তু এই তত্ত্বের সাথে অনেকেই একমত না। এটা আসলে অনুকল্প মাত্র, তত্ত্বের পর্যায়ে নয়। এত আগের ঘটনা স্বচক্ষে না দেখে কেবল অনুমান করা যায়, যার বিপক্ষে পর্যবেক্ষন-যুক্তি বিদ্যমান। যেমন মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. ডেভিড লুডেন এ ব্যাপারে বলেন[১৮]:

> Social theories of language evolution emphasize the fact that language is, first and foremost, a form of social behavior... Yet social theories of language evolution all suffer from the same explanatory gap. Specifically, the question is how meaningless vocalizations could have evolved into utterances with not only meaning but also complex structure. Even the "sweet nothings" that lovers whisper to each other usually come in the form of complete sentences. The gossip-as-grooming hypothesis has an even larger gap to explain, namely the transition from physical grooming to vocal interaction.

অর্থাৎ, 'ভাষা বিবর্তনের সামাজিক তত্ত্বগুলো বলতে চায় ভাষা আসলে এক প্রকার সামাজিক আচার। ... কিন্তু এই তত্ত্বগুলোর সবক'টিতেই একই এক্সপ্লেনেটরি গ্যাপ বিদ্যমান। বিশেষ করে কিভাবে অর্থহীন শব্দগুলো অর্থের দ্যোতনা ও জটিল রূপ ধারণ করল এই প্রশ্নে। এমনকি প্রেমিকযুগল কানাকানিতে যে অন্তরঙ্গ আলাপ করে তাও সচরাচর পূর্ণবাক্যের হয়ে থাকে। তা ছাড়া এই গপ্পো-গ্রুমিং অনুকল্প আরও বড় ফারাক ব্যাখ্যা করতে পারে না, যেমন শারীরিক গ্রুমিং থেকে কিভাবে কথার আবির্ভাব হলো।'

এই গপ্পো-গ্রুমিং অনুকল্প নিয়ে হারারির আরও কড়া সমালোচনা করেছেন তেল-আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্লোমো শান্দ। তিনি

বলেন[১৯]:

> The writing swept me away, his imagination flows and is fascinating, but then I came to the part in which he describes the birth of human language as sitting around the campfire and I was very disappointed. I put the book aside and for a long time I didn't return to reading it. The human language was not created as a need for gossip. This is a statement that is appropriate for someone who sat for too long in the cafeteria. Harari takes hypotheses and presents them as facts. It is appropriate for a storyteller but not a historian.

অর্থাৎ, 'বইটা প্রথমে হাতে পেয়ে আমি তো অবাক! তার কল্পনার ক্ষমতা আসলেই চমকপ্রদ। কিন্তু যখন মানবের ভাষা কিভাবে জন্ম নিলো এই আলোচনায় এলাম দেখি তিনি লিখেছেন - ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে গপ্পো করার মাধ্যমে ভাষা জন্ম নিয়েছে। আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি এটা দেখে। বইটা পড়া বাদ দিয়ে দিই তখনই, বহুদিন আর বইটার ধারেকাছেও আসিনি। মানবের ভাষা গপ্পো করার চাহিদা থেকে তৈরি হয় নি। এই ধরনের কথাবার্তা তার মুখেই মানায় যে অনেক বেশি সময় চায়ের দোকানে বসে বসে কাটায়। হারারি অনুকল্পকে একেবারে ফ্যাক্ট হিসেবে তুলে ধরে। এই কাজ গল্পবলিয়েদের জন্য মানায়, ইতিহাসবিদের জন্য না।'

এ তো গেল ভাষার উৎপত্তি। এদিকে ভাষার অনন্যদিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে হারারি বলেছেন (পৃ. ২৭):

> [T]he truly unique feature of our language is ... the ability to transmit information about

> things that do not exist at all. As far as we know, only Sapiens can talk about entire kinds of entities that they have never seen, touched or smelled... if you spend hours praying to non-existing guardian spirits, aren't you wasting precious time, time better spent foraging, fighting and fornicating? But fiction has enabled us not merely to imagine things, but to do so collectivel. We can weave common myths such as the biblical creation story, the Dreamtime myths of Aboriginal Australians, and the nationalist myths of 1nodern states. Such myths give Sapiens the unprecedented ability to cooperate flexibly in large numbers.

অর্থাৎ, 'মানুষের ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই ভাষায় মানুষ কাল্পনিক ঘটনা বা বস্তু, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই তার গল্প অন্যদের কাছে করতে পারে। আমরা যতদূর জানি, স্যাপিয়েন্সই একমাত্র প্রাণী, যারা যেসব জিনিস কখনো চোখে দেখেনি, স্পর্শ করেনি কিবা স্বাদ নেয়নি সেসব নিয়েও অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে পারে... কেউ যদি অস্তিত্বহীন রক্ষাকারী-দেবতার আরাধনায়ই ব্যস্ত থাকে, তা হলে এই সময় তো অপচয়মাত্র। সে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে কখন, খাবার জোগাড় করবে কখন কিংবা রতিক্রিয়ার সময়ই বা পাবে কখন?'

এখানে হারারি বেশ কট্টর অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন ঝেড়েছেন। কিন্তু এটা যে ভুল তা ঠাহর করতে আপনাকে মহাপণ্ডিত হতে হবে না। সংস্কৃতি হলো কিছু ধারণা ও আদর্শের সমষ্টি। বাই ডিফল্ট এর বস্তুগত উপাদান নেই, বস্তুগত প্রকাশ আছে। তার মানে এই না যে এটা স্রেফ কল্পনা। কেউ যদি বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্রেফ কল্পনা

তা হলে তাকে রাজাকার বলে দেশছাড়া করা হবে। হলপাইক আরও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন:

> If Harari's test of reality is only what we can see, touch, or smell then mathematics, like truth, should also be a prime example of fiction... And if mathematics is fiction, then so is the whole of science including the theory of relativity and Darwinian evolution, which Harari would find very embarrassing indeed because he loves science. He is just in a philosophical muddle that confuses what is material with what is real, and what is immaterial with fiction. But the opposite of fiction is not what is material but what is true, and what is fictional and what is true can both only exist in the immaterial world of thought.

অর্থাৎ, 'যদি হারারি বাস্তবতাকে শুধু দৃষ্টি, স্পর্শ ও গন্ধ দিয়েই যাচাই করার দ্বারাই সংজ্ঞায়িত করতে চান তা হলে সত্যের মতো গণিতও কল্পকাহিনীর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ... আর যদি গণিত ফিকশনই হয়, তা হলে তো আপেক্ষিকতার তত্ত্ব কিংবা ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের মতো বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই। হারারি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে লজ্জায় পড়ে যাবেন, কারণ তিনি তো বিজ্ঞানকে খুবই ভালোবাসেন। আসলে তিনি দর্শনের কুয়ায় পড়ে আছেন যেখানে তিনি বস্তুকে বাস্তবতার সাথে আর অবস্তুগত সবকিছুকে কল্পনার সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। অথচ কল্পনার বিপরীতে পার্থিব জগৎ নয়, বরং সত্যকে পাওয়া যায়। আর কোনো বিষয় ফিকশন না সত্য, তা শুধু অধরা চিন্তাজগতের সাহায্যেই যাচাই করা সম্ভব।'

হলপাইক যা বলতে চাচ্ছেন তা হলো, যদি আপনি সত্যিই হারারির মতো ইন্দ্রিয়লব্ধ জগতের বাইরের সবকিছুকে অস্বীকার করতে চান তা হলে আপনাকে ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির মতো করে গণিত অস্বীকার করতে হবে, যুক্তি অস্বীকার করতে হবে—এগুলোর কোনোটাই ধরা-দেখা-শোঁকা যায় না। ফলে বিজ্ঞানের সব সূত্রকে ছুড়ে ফেলতে হবে। আর আপনার নিজের চিন্তাটাই যেহেতু ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেটাকেও আপনি তখন আর মেনে নিতে পারবেন না, কারণ এটা স্রেফ ফিকশন; বস্তুগত অস্তিত্ব নেই তো।

কী অদ্ভুত স্ববিরোধী অবস্থান একবার ভেবে দেখুন!

তা ছাড়া ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রচলনও এক জিনিস না। দুটোই অবস্তুগত হওয়ায় হারারি তা গুলিয়ে ফেলেছেন। ঢাকার রাস্তায় বামদিকে গাড়ি চালাই আমরা, যে রুটেই যাই না কেন—ডানদিক দিয়ে বিপরীত দিকের গাড়ি যায়। এটা একটা সামাজিক প্রচলন, যা সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের ফসল। গাড়ির কোম্পানি পুজোও (Peugeot) এমন কনভেনশানের ফসল। অন্যদিকে অতিপ্রাকৃত জিনিসে বিশ্বাস হলো মানবের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফসল। ব্যাপারটা এমন না যে সবাই মিলে ভোটাভুটি করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন থেকে অমুকে উপাসনা হবে, অমুকের পূজা হবে। সামাজিক প্রচলন আর ধর্মীয় বিশ্বাস এক জিনিসই হবে এমন না। এই দুটো গুলিয়ে ফেলে হারারির কোনো ফায়দা হবে না, হলাপাইক এমনটাই বলতে চান।

বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব থেকে কৃষিবিপ্লবে আসার মাঝপথে মানুষ কী করেছে তা নিয়ে হারারি বলেছেন (পৃ. ৬৮-৬৯):

> These long millennia may have witnessed wars and revolutions, ecstatic religious movements, profound philosophical theories, incomparable artistic masterpieces... The foragers may have had their all-conquering Napoleons who

> ruled empires half the size of Luxembourg; gifted Beethovens who lacked symphony orchestras but brought people to tears with the sound of their bamboo flutes" and so on.

কিন্তু এটা দেখে হলপাইক খেদ উগড়ে দিয়ে বলেছেন, এসব বাজে আলাপ। কারণ এসকল ঘটনার জন্য বড় জনগোষ্ঠী, নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এবং সম্ভবত সাক্ষরজ্ঞানওয়ালা সভ্যতার দরকার। এসবই কৃষিবিপ্লবের পরে হয়েছে, অথচ হারারি গল্প জুড়তে গিয়ে সেসব কৃষিবিপ্লবের আগে টেনে এনেছেন। একইভাবে রাষ্ট্রের সূত্রপাত নিয়েও হারারির কড়া সমালোচনা করেছেন হলপাইক। তিনি বলেছেন:

> Unfortunately, Harari not only knows very little about tribal societies but seems to have read almost nothing on the literature on state formation either

অর্থাৎ, 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আদিসমাজ নিয়ে হারারি তো খুব অল্প জানেন, কিন্তু রাষ্ট্রের সূত্রপাত নিয়ে তিনি দেখছি কিচ্ছু জানেন না।'

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার নিমিত্তিতে এই ব্যাপারে অধ্যাপক হলপাইকের সমালোচনার পুরোটা উল্লেখ করা হলো না। বোদ্ধা পাঠকদের কেউ বিস্তারিত পড়তে চাইলে অধ্যাপকের রিভিউ ঘেঁটে দেখতে পারেন।

ধর্ম নিয়ে যত কথা

মানুষের ধার্মিক প্রকৃতি নিয়েও হারারি আলোচনা করেছেন। কীভাবে ধর্মগুলো এল, সেসব নিয়েও কথা বলেছেন। তবে সে আলোচনা যাচাই করার আগে বিজ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে কিছু বুনিয়াদি আলাপ করে নিই। স্রষ্টা বা অতিপ্রাকৃত কিছু নিয়ে বিজ্ঞান কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা দ্বারা কোনোভাবেই এই ধরনের কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই ভিত্তি বা পূর্বানুমানকে বলা হয় প্রকৃতিবাদ (methodological naturalism)। সহজ কথায় জাগতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা হিসেবে যে-কোনো মূল্যে কেবল জাগতিক কার্যকারণ প্রস্তাব করা।

ধরুন, আপনি একটা রুমে ঢুকে লাল রঙের যা কিছু পেলেন তা সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন। এরপর যদি রুমটায় লাল রঙের কিছু দেখতে না পেয়ে গোটা পৃথিবীতেই লাল রঙের অস্তিত্ব নেই বলে দাবি করা শুরু করেন, তা কি যুক্তিযুক্ত হবে? অবশ্যই না। এটা হচ্ছে সার্কুলার রিজনিং নামের এক ধরনের কুযুক্তি (logical fallacy)। যেটায় আপনি যে সিদ্ধান্তে (conclusion) পৌঁছাতে চাচ্ছেন সেটা আগে থেকে (premise) সঠিক ধরে নিয়েই বিশ্লেষণ শুরু করেন। জীববিজ্ঞান দেখিয়েছে স্রষ্টা নেই—এহেন দাবিও এমনই এক কুযুক্তি। হারারি আসলে তার বয়ান দিয়ে আমাদের দেখালেন

সার্কুলার রিজনিং ফ্যালাসি কিভাবে করা লাগে! বিজ্ঞান তো শুরুতেই বলেছে—যাহা ব্যাখ্যা দিব জাগতিক ব্যাখ্যা দিব, জাগতিক বই অতিপ্রাকৃত নিয়ে কিছু বলবা না! কারণ এটা তার নাগালেরই বাইরে। যে জিনিস নাগালেই নাই, সেটা নিয়ে কথা বলবে কিভাবে? বিজ্ঞানের এই প্রকৃতিবাদী কিন্তু চেতনা বেশিদিন আগের না। ভিক্টোরিয়ান ইউরোপের শেষের দিকে উগ্র সেক্যুলার ও নাস্তিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয় এবং তখন এই ধারণাটা চালু করা হয়। তার আগ পর্যন্ত মুসলিম, খ্রিস্টান বা এনলাইটেনমেন্টের একত্ববাদী বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতের চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় এই প্রতিজ্ঞা জরুরি ভাবতেন না।

সচেতন কেউ বলতে পারেন এটা হাল আমলের বিজ্ঞানের একটি পক্ষপাতদুষ্টতা। আমি তাদের দাবি উড়িয়ে দিবো না। বরং দেখা যায় পশ্চিমা অ্যাকাডেমিকরাই এই বিষয়ে কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে নামকরা জিনবিদ রিচার্ড লেউনটিন-এর কথা উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন[২০] :

> বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃত কিছুর (যেমন স্রষ্টা) মাঝে আসল দ্বন্দ্বকে যদি বুঝতে চান, তা হলে আমাদেরকে দেখুন। কমনসেন্স-বিরোধী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমাদের কতই-না আগ্রহ। ... বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে 'শিশুতোষ গল্প'-এর মতো অপ্রমাণযোগ্য ধারণা মেনে নিতেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ আমরা আগে থেকেই প্রকৃতিবাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ব্যাপারটা এমন নয় যে—এই বিস্ময়কর জগৎ সম্পর্কে একটি জাগতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের বাধ্য করে। বরং, শুরু থেকেই প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য হই, জগৎ অনুসন্ধানের এমন কিছু উপকরণ ও ধারণা তৈরি করতে—যা কেবল জাগতিক ব্যাখ্যারই জন্ম দেবে। সে ব্যাখ্যা যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন হোক, আমজনতার কাছে যতই দুর্বোধ্য ঠেকুক!

> আসল কথা হলো, আমরা ঈশ্বর নিয়ে কথাবার্তা সহ্য করব না। তাই আমাদের নিকট প্রকৃতিবাদ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

আমজনতা মনে করে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই বলেই বিজ্ঞান খুঁজে পায় নি। অথচ বাস্তবতা হলো—যা কিনা লেউনটিনও বলছেন—আজকে বিজ্ঞান আগেই প্রতিজ্ঞা করেছে আমি এসব কথা বলবো না, হাজার প্রমাণ পেলেও সেই সিদ্ধান্তের দিকে যাবো না। জীববিজ্ঞানী স্কট টডের জবানে বললে[২১] :

> জগতের সকল উপাত্তও যদি কোনো বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে, তারপরও এমন ব্যাখ্যা বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হবে। কারণ এই ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদী নয়, জগতে আবদ্ধ নয়।

যদিও লেউনটিন তার বক্তব্যে প্রকৃতিবাদের সাথে নিজের দার্শনিক বিশ্বাস বস্তুবাদকে গুলিয়ে ফেলেছেন, যা সকল বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নয়। তবে প্রকৃতিবাদের দার্শনিক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকার আবশ্যিকতার কারণে নৃতত্ত্ববিদরা কখনো বলবেন না যে, মানুষের মাঝে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের সহজাত অনুভূতি (ফিতরাহ) আছে তাই তারা বিশ্বাসপরায়ণ। অথবা তারা বলবে না যে স্রষ্টা আছেন তাই মানুষ তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাঁর উপাসনা করে। প্রকৃতিবাদী কর্মধারায় চিন্তাজগৎ বাঁধা থাকার কারণে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাকানোর আগেই তারা ধরে নিবেন—স্রষ্টা তার নাগালের বাইরে। তাই কেবল জাগতিক ব্যাখ্যাই দাঁড় করাতে হবে।

এবার ধর্ম নিয়ে হারারি কী বলতে চাইছেন তা দেখা যাক। অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদেরাও এই ব্যাপারে কথা বলেছেন। প্রকৃতিবাদী চেতনা থেকেই বলেছেন। কিন্তু এরপরও হারারি এখানে ভুল করেছেন! অদ্ভুত না! বারাক ওবামার পড়তে বলা বইয়ের এই দুর্দশা! হারারি তিনি এক জায়গায় বলেছেন (পৃ. ১১৫):

> When the Agricultural Revolution opened opportunities for the creation of crowded cities and mighty empires, people invented stories about great gods, motherlands and joint stock companies to provide the needed social links.

অর্থাৎ, 'কৃষিবিপ্লব এসে ঘনবসতিপূর্ণ শহর আর সুবিশাল সাম্রাজ্য তৈরির পথ করে দেবার পর মানুষেরা নিজেদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির খাতিরে বিভিন্ন দেবতা, মাতৃভূমি ও যৌথ মূলধন, সমিতি নিয়ে গল্প ফাঁদে।'

হারারির লেখায় বেশ সাহিত্যিক ছাপ আছে বলতে হয়। কী সরল বিশ্লেষণ! তবে সমস্যা হলো তার বই দোকানের নন-ফিকশন অংশে কিনতে পাওয়া যায়, ফিকশন অংশে থাকা উচিত ছিল। হারারির কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও নৃতত্ত্ববিদদের নিজেদের মধ্যেই এটা নিয়ে ভিন্নমত আছে। যেমন হলপাইক বলছেন:

> The idea of people 'inventing' religious beliefs to 'provide the needed social links' comes out of the same rationalist stable as the claim that kings invented religious beliefs to justify their oppression of their subjects and that capitalists did the same to justify their exploitation of their workers. Religious belief simply doesn't work like that.

অর্থাৎ, 'মানুষ সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মীয় চিন্তা উদ্ভাবন করবে এই যুক্তিটা মূলত—রাজা কর্তৃক প্রজাদের ওপর অত্যাচার কিংবা পুঁজিবাদীদের দ্বারা শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারকে ন্যায়সঙ্গত রূপ দেবার জন্য ধর্ম সৃষ্টি করা হয়েছে—এই একই গোয়াল থেকে নেওয়া। ধর্মীয় বিশ্বাস মোটেই এভাবে কাজ করে না।'

হারারির মুখে নৃতত্ত্বের আলাপ শুনে মনে হয় স্পষ্ট উত্তর আমরা পেয়ে গেছি। কিন্তু জ্ঞানের এই শাখার পণ্ডিতদের লেখাজোঁকা পড়লে দেখা যায় এই বিষয়ে তাদের মাঝেই নানা মতভেদ। প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস আবির্ভূত হল তা এখনো তাদের কাছে ধোঁয়াশা।

আরেকটা বিষয় বুঝে নিন। বিবর্তিত হওয়া মানেই উন্নত হওয়া নয়। কোনো জীব যত বড়, বুদ্ধিমান ও জটিল গঠনের হবে, ওই জীব ততটাই বিবর্তিত-বিকশিত—এরকম একটা ধারণা অনেকের মাঝেই কাজ করে। এই ধারণা একেবারে গলদ। বিবর্তনের সাথে আসলে সম্পর্ক প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকার ও বংশ জারি রাখার। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্যকৃষকও আইজ্যাক নিউটনের মতো বিজ্ঞানীর থেকে বেশি 'বিবর্তিত' হিসেবে গণ্য হবেন যদি সেই কৃষকের বংশধরের সংখ্যা হয় সন্তানহীন নিউটনের থেকে বেশি! মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতিতে নিউটনের অবদান ওই কৃষক থেকে বহুগুণে বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিবর্তনের ধারায় কৃষকটিই এগিয়ে থাকবে। এমনকি হারারির চেয়েও বিবর্তনের ধারায় অশিক্ষিত কৃষকটি বেশি এগিয়ে থাকবে! কারণ হারারি একজন সমকামী। তার কোনো সন্তান নেই, আছে কেবল পোষা কুকুর!

প্রাকৃতিক নির্বাচন আপনার বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক অবদান, নৈতিক আন্দোলন, মানবাধিকার কর্ম কিংবা শরীরের গঠন নিয়ে এতটুকুও পরোয়া করবে না। বিবর্তনের মাপকাঠিতে আপনার সাফল্য শুধুমাত্র পৃথিবীতে আপনার রেখে যাওয়া সন্তানের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির জন্য ধর্ম নামক কল্পকাহিনীর আশ্রয় নেওয়ার দাবি বিবর্তনের সাথে মেলে না। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রজাতি হিসেবে ভবিষ্যৎ সাফল্যের চিন্তা করে আমরা ধর্ম বানিয়েছি। কিন্তু প্রজাতির তো কোনো সামষ্টিক চৈতন্য নেই। তা ছাড়া অন্ধ, উদ্দেশ্য-চেতনাহীন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া এরকম কোনো বিষয়কে সামনে রেখে এগিয়ে যাবে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনো এজেন্ডা মাথায় রেখে

কাজ করে না। কারণ সেটার নিজস্ব দূরদর্শিতা তো পরের কথা, নিজস্ব বুদ্ধিমত্তাই নেই। ফলাফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, মানুষের মধ্যে সামাজিকতা বা ধর্ম সৃষ্টি হবার সাথে বিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। হারারির মনগড়া গল্প কোনোদিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না।

হারারির ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে বহুল প্রচলিত বয়ানকে নতুন বোতলে উপস্থাপন করেছেন। আরেকটি দাবি যাচাই করা যাক। তিনি বলেছেন (পৃ. ২৪১-২৪২):

> When animism was the dominant belief system, human norms and vaues had to take into consideration the outlook and interests of a multitude of other beings, such as animals, plants, fairies and ghosts ... The Agricultural Revolution initially had a far smaller impact on the status of other members of the anin1ist system, such as rocks, springs, ghosts and demons. However, these too gradually lost status in favour of the new gods ... With time some followers of polytheist gods became so fond of their particular patron that they drifted away from the basic polytheist insight. They began to believe that their god was the only god, and that He was in fact the supreme power of the universe.

অর্থাৎ, 'একটা সময় সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে বেশ প্রবল ছিল। সে সময় মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচরণ সবই তৈরি হতো নানা রকম পশুপাখি, গাছপালা কিংবা পরি, ভূতপ্রেত- এসব ঘিরে। ... পাথর, ঝরনা বা ভূতপ্রেতের আরাধনার যে ধর্ম

আগে প্রচলিত ছিল, শুরুতে তার ওপর কৃষিবিপ্লবের প্রভাব ছিল সামান্যই। কিন্তু ধীরে ধীরে এগুলো তাদের আবেদন হারাতে শুরু করে, আর তাদের জায়গা নিয়ে নেয় নতুন দেবতারা। ... এই প্রয়োজন মেটাতেই একসময় বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ... সময়ের সাথে সাথে কিছু বহু-ঈশ্বরবাদী নির্দিষ্ট কোনো খোদার প্রতি এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে তারা মূল বহু-ঈশ্বরবাদী ধারণা থেকে দূরে সরে যায়। তারা ভাবতে শুরু করে তাদের ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর এবং তিনিই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান সত্তা।'

ছোটবেলায় সমাজবিজ্ঞান বইতেও এমন বয়ান আমরা পড়েছি। এনিমিস্টিক বা সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস থেকে শুরু হয়ে মানুষ বহু-ঈশ্বরবাদীতায় আসে। তারপর কোনো একটা সময়ে অজ্ঞাত/অনুমিত কোনো কারণে একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠে। সেই সাথে তাদের বিশ্বাসকে পূর্ণতা দেবার উদ্দেশ্যে তারা নানাবিধ গল্প তৈরি করে। ষোড়শ শতকে সেই ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পকাহিনী থেকে মুক্তির মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞানের আবির্ভাব। এরপর থেকে আমরা হলাম যুক্তিবাদী, নিধর্মী! তবে বাস্তবতা হলো এই বয়ান পুরোটা গলদ।[২২]

এমনকি এখানে এসে হলপাইকও আটকে গিয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের নৃবিজ্ঞানীগণ ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্বের ধারণার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। তারা প্রকৃতিবাদী অনুমানের উপর চড়ে ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় বিভিন্ন জাগতিক তত্ত্ব দাঁড় করাতে শুরু করেন। তারা ধারণা করেন—আদিমানবের চিন্তাক্ষমতা ছিল অবিকশিত। তাদের অভিজ্ঞতা কম ছিল, বিজ্ঞানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার মননশীলতা ছিল না। তারা অনুমান করেন—আদিম মানুষ ছিল অনেকটা শিশুর মতোই, যাকে তারা *প্রিমিটিভ মাইন্ড* বলে অভিহিত করেন। নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলর মত দেন—আদিমানবের মনে মৃত্যু, স্বপ্ন, ছায়া প্রভৃতি থেকে আত্মার ধারণা আসে। তারপর এই আত্মার ধারণা ছড়িয়ে পরে সকল বস্তুতে। এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, সবকিছুরই আত্মা আছে। একে বলা হয় সর্বাত্মাবাদ বা সর্বপ্রাণবাদ

(Animism)। সর্বপ্রাণবাদের ধারণা কিন্তু শুরু থেকেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যারেট দ্বিমত পোষণ করে বলেন : ধর্মের প্রথম স্তর হলো প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ (Pre-Animism)। এদিকে ফরাসি সমাজবিদ এমিল ডুর্খেইম এসে বললেন, তোমাদের কথা মানি না, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বরং টটেমিজম-এর থেকে। জেমস ফ্রেজার আবার অন্য কথা বলে বসলেন। তিনি বললেন—নারে বাবা, শোন! আগে জাদু এসেছে, তারপর ধর্ম, তারপর ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সূচনা। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন জানাচ্ছে—*এই সর্বাত্মাবাদের তত্ত্ব এখন পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে!* এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে, আজকের চিন্তাবিদদের মতে আদিমানব সম্পর্কে এমন ধারণা একেবারেই ভুল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন জানাচ্ছে—*ফ্রেজারের মত এখন পুরোপুরি পরিত্যাক্ত*। ডিকশনারি অব সোশিয়াল সায়েনস-এ বলা হয়েছে:

> টেইলর আর ম্যারেট-এর সর্বপ্রাণবাদ ও প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ কোনটি আগে বা পরে উদ্ভব হয়েছে, এ নিয়ে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে যে বাদানুবাদ চলে আসছিল, এখন তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কাল্পনিক ছদ্ম-ইতিহাসের গল্প ফাঁদা বা সর্বত্র একইরূপে বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভব হয়েছে এমন অনুমান করা, এসবে আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের আর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই।

হারারি এত কিছু খুঁজতে যাননি, গদবাঁধা কথাবার্তা চালিয়ে দিয়েছেন। বলতে চেয়েছেন এসব প্রাথমিক ধারণার পরে ক্রমান্বয়ে বহুঈশ্বরবাদ দেখা দিয়েছে। তারও অনেক পরে, একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়েছে। অথচ ধর্মের ক্রমবিকাশ নিয়ে আঁকা এইসব ধারণা প্রায় ৫০-৬০ বছর আগেই বাতিল হয়ে গেছে অ্যাকাডেমিয়ায়। এসব তথাকথিত ক্রমবিকাশের পর্যায় সম্পর্কে খ্যাতনামা অক্সফোর্ড নৃবিজ্ঞানী স্যার অ্যাডওয়ার্ড ইভানস প্রিচার্ড, আরেক নৃতত্ত্ববিদ

ফ্রেডেরিক শ্লেটার-এর সাথে একমত হয়ে বলেন :

> [ধ]র্মের প্রারম্ভিক অবস্থার স্বরূপ ও তা থেকে ধারাবাহিক পর্যায়ে তথাকথিত বিকাশের যত ছক আঁকা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই একেবারে খামখেয়ালিপূর্ণ ও লাগামহীন ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো। কোনো তত্ত্বই এর ব্যতিক্রম নয়।

কেন এই সকল আজগুবি তত্ত্ব দাঁড় করানো হলো এ সম্পর্কে প্রফেসর ইভানস প্রিচার্ড (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত) তার সাড়া জাগানো Theories of Primitive Religion বইতে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

কারণ ০১: সেকালে সমাজবিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে অধিক উন্নত ও বিকশিত প্রাণের উদ্ভব হয় (Progress)। আমরা হলাম ক্রম-উন্নয়নের পথের এক প্রান্তে, আর আদিমানবেরা হলো অপর প্রান্তে। শুরুতেই (a priori) এই অনুমান করা হয়েছে, তত্ত্ব দাঁড়িয়েছে সেটার উপর। তাই আদিমানবদের শিশুসুলভ, মোটা বুদ্ধির উড়নচণ্ডী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনেকটা পশুতুল্য, আহাম্মক টাইপের ভাবা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, একদিকে ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্ব অনুযায়ীই এ ধারণা ভুল। কারণ বিবর্তনের ফলে অধিক উন্নত, বিকশিত প্রাণ তৈরি হয় না; স্রেফ বেঁচে থাকা ও বংশবিস্তারে চলনসই প্রাণের আবির্ভাব হয়। অন্যদিকে প্রফেসর ইভানস জানিয়েছেন—প্রায় পঞ্চাশ বছরের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বলছে, আদিমানব সম্পর্কে এমন পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা ত্রুটিপূর্ণ ও আবর্জনায় ভরপুর।

কারণ ০২: আমেরিকার নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ দাসপ্রথার পক্ষে সমর্থন যোগাতে এইসব তত্ত্ব প্রসার ঘটিয়েছেন। আদিমানবদের এমনভাবে উপস্থাপন করা উপনিবেশবাদীদের স্বার্থোদ্ধারে বেশ কাজে লেগেছিল। আবার কেউ কেউ বিবর্তনের ধারায় বানর ও মানুষের মাঝে হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র (missing link) খুঁজে বের

করার ধান্দায় এসকল লাগামছাড়া তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন। যার বাস্তবিক প্রয়োগও ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। এককালে কঙ্গোর আদিবাসী ওটা বেঙ্গা, লাউসের আদিবাসী ক্রাও ফারিনি প্রমুখকে মানুষ আর পশুর মাঝে মিসিং লিংক হিসেবে প্রদর্শন করানো হত! এমন ঘটনার অভাব নেই!

কারণ ০৩: এসকল গবেষকদের একাংশ ধর্মকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে তত্ত্বগুলো প্রসার করতে চেয়েছেন! নৃবিজ্ঞানী স্যার ইভানস স্বীয় পর্যবেক্ষণ জানান:

> আমি মনে করি—পণ্ডিতদের এসব তত্ত্বের কাঠামো বুঝতে হলে, এদের একটা বড় অংশের অভিসন্ধি বুঝতে হবে। তারা খ্রিস্টবাদকে পরাস্ত করতে প্রাণঘাতী অস্ত্রের সন্ধানে ছিলেন এবং ভেবে বসেন আদিধর্মে তার খোঁজ পেয়ে গেছেন। যদি আদিধর্মকে মস্তিষ্ক বিকৃতি, মানসিক চাপ বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ফলে তৈরি মরিচিকাসদৃশ বলে দাঁড় করানো যায়, তা হলে উচ্চতর ধর্মগুলোকেও একই পন্থায় নিন্দা করে ঝেড়ে ফেলা যাবে। কারো কারো লেখনীতে তো এই ব্যাপার প্রায় স্পষ্টই চোখে পড়ে।

অন্যদিকে বস্তুবাদী গবেষকদের এসকল ধারণার বিপরীতে শুরু থেকেই মানুষ একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল এমন প্রমাণ মিলতে শুরু করে। সেকালের নৃবিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম তা আমলে নেন নি। পরে টেইলরের প্রিয় ছাত্র, সাহিত্যিক ও নৃতত্ত্ববিদ অ্যান্ড্রু ল্যাং *The Making of Religion* (১৮৯৮) গ্রন্থে প্রমাণ দেখিয়েছেন—সৃষ্টিশীল, নৈতিক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ একক স্রষ্টার ধারণা পৃথিবীর একেবারে আদিমতম মানবদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল! ল্যাং দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে, একেশ্বরবাদের অস্তিত্বই প্রথম; পরে তা বিভিন্নভাবে কলুষিত হয়ে পড়ে। নৃবিজ্ঞানী ড. পল রেডিন বলেন:

> ল্যাং সাহেব তাঁর বই লেখার পর পঁচিশ বছর কেটে গেল। তিনি যা ভেবেছিলেন তার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি মিলেছে। আগের নৃবিজ্ঞানীরা পুরোই ভুলের ওপর ছিলেন। বিশেষজ্ঞ গবেষকদের পাওয়া নিখুঁত তথ্যপ্রমাণ ল্যাং সাহেবের অস্পষ্ট দৃষ্টান্তগুলোকে সরিয়ে আরও জোরালো প্রমাণ দাঁড় করিয়েছে। অনেক আদিম মানব যে এক সর্বোচ্চ-অদ্বিতীয় বিধাতায় বিশ্বাস করত, এনিয়ে এখন কারও তেমন একটা দ্বিমত নেই।

পরবর্তী কালে প্রখ্যাত জার্মান নৃতত্ত্ববিদ উইল্‌হেম স্মিত ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারায় এক বিপ্লব ঘটান। নিজের গবেষণা থেকে তিনি জানান যে, আদিমানবের মাঝে সর্বপ্রথম ধর্ম ছিল এক মহান খোদায় বিশ্বাস, যা কিনা *Primal Monotheism*। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন:

> [T]he Origin of the Idea of God গ্রন্থে উইলহেম স্মিত বলেছেন, (প্রাচীনকালের) পুরুষ ও নারীরা একাধিক দেবতার উপাসনা শুরু করার পূর্বে তাঁদের মাঝে আদি একেশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল। শুরুতে তারা কেবলমাত্র এক ও অদ্বিতীয় খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করত—যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন ও দূর থেকে মানুষের নানা বিষয় নজরে রাখছেন। এমন মহান খোদায় বিশ্বাস এখনও অনেক আদিবাসী আফ্রিকান গোত্রের ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। তারা ব্যাকুলভাবে খোদার কাছে প্রার্থনা করে। বিশ্বাস করে যে, তিনি তাদের নজরদারি করছেন এবং খারাপ কাজ করলে তিনি শাস্তি দিবেন। কিন্তু অবাক করার মতো ব্যাপার হলো—তিনি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে (মূর্তরূপে) অনুপস্থিত: তাঁর কোনো বিশেষ পূজা-অর্চনা ছিল না এবং কখনোই তাকে প্রতিমায় রূপ দেওয়া হয়নি। আদিবাসীদের মতে তিনি অনির্বচনীয় এবং এমন সত্তা যিনি দুনিয়া দ্বারা কলুষিত হওয়ার নন। কেউ কেউ আবার বলে যে, তিনি অপগত। নৃতত্ত্ববিদদের

> মতে, (সময়ের আবর্তে) এই খোদা (তাদের নিকট) এত দূরবর্তী ও সুউচ্চ মনে হতে থাকে যে, কার্যত তিনি ছোটখাটো ও আরও সহজলভ্য দেবতাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করেন। স্মিত-এর তত্ত্বও এমনটাই বলে যে—প্রাচীনকালে সেই মহান খোদা (ক্রমান্বয়ে) পৌত্তলিকতার বেড়াজালে আরও চকমকে দেবতাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যান। শুরুতে তাই এক খোদাই ছিলেন।

গবেষণার ফল থেকে উইল্‌হেম স্মিত ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন আদিবাসীরা সম্ভবত কোনো প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, যা পরে বিকৃত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর দিকে তাকালেও হারারির দাবির অসারতার চোখে পড়ে। যেমন বহু-ঈশ্বরবাদীতার কথা এলেই হিন্দুধর্মের কথা ওঠে। কিন্তু এই ধর্মটাও বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদ সৃষ্টির চিন্তাধারার সাথে খাপ খায় না। বর্তমানে বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে রূপ নিলেও শুরুর দিকে হিন্দুধর্ম এরকম ছিল না বলে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোয় স্রষ্টার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি নিয়ে যে আলোচনা এসেছে তা অনেকাংশেই বর্তমান সময়ের একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর মতো। বলা হয়েছে স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬:২:১), তিনি বিমূর্ত (শ্বেতশ্বতর উপনিষদ ৪:১৯, যজুর্বেদ ৩২:৩), তাকে চোখে দেখা যায় না (শ্বেতশ্বতর উপনিষদ ৪:২০) ইত্যাদি। তা ছাড়া পারস্যের জরথ্রুধর্ম, চীনের তাওইজম, কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার অ্যাজটেক সভ্যতা, মায়া সভ্যতা ও ইনকা সভ্যতার ধর্মের দিকে নজর দিলে তার সাথে বর্তমান একেশ্বরবাদের অনেক মিল পাওয়া যায়।

বিভিন্ন আদিবাসী গোত্রের মাঝে এখনো একত্ববাদের নজির পাওয়া যায়। কখনোই বাইরের সভ্যতার সংস্পর্শ পায়নি এমন অনেক বিচ্ছিন্ন আদিবাসী পাওয়া যায়, যাদের বিশ্বাসের মাঝে অদ্ভুত মিল! জানা যায়—তারা এক খোদার উপাসনা করত, তাদের কাছে খোদাপ্রেরিত বাণী ছিল কিন্তু সেটা হারিয়ে গেছে। তারা প্রতীক্ষায়

আছে এমন একজনের, যে তাদের কাছে সেই হারিয়ে যাওয়া বাণীকে ফিরিয়ে আনবে। লাহু-কারেন-কাচিন-কুই-লিশু-মিয়ো-সাঁওতাল-সহ আরও অনেক আদিবাসীদের মূল বিশ্বাস এমন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্যারাগুয়ের আদিবাসীদের মধ্যে এখনো অনেকেই রয়েছে যারা বাকিদের মতো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করে তাদের প্রাচীন একেশ্বরবাদী ধর্ম আঁকড়ে ধরে রেখেছে। মানে হারারি যা গল্প ফেঁদেছেন বাস্তবতা তার উল্টো।

দুঃখজনক হলেও সত্য, হলপাইক এদিকটা একদমই আলোকপাত করেননি। বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদ আসা ধারণা যে সেক্যুলার অ্যাকাডেমিয়াতেই অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণ করেন না এই বাস্তবতা হলপাইকের লেখায় না পেয়ে আমি হতাশ হয়েছি।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন কেন আমাদের পাঠ্যবই বা জনপ্রিয় বইপত্রে এসব গবেষণার কথা জানানো হয় না। এর একটা কারণ হতে পারে, আদিমানব একেশ্বরবাদী স্বীকার করলে বিবর্তন তত্ত্বের প্রতি তা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, বস্তুবাদী গবেষকদের অনুমিত ক্রমধারা অনুযায়ী, একেশ্বরবাদ আধুনিক মানুষের উন্নত মস্তিষ্কের ফসল। সেকেলে নৃতত্ত্ববিদেরা ভেবেছিলেন, আদিমানবের মস্তিষ্ক তো অনুন্নত ছিল। তাই আদিমানবদের মাঝেও যদি একেশ্বরবাদ পাওয়া যায় তা হলে, তাদের যে তথাকথিত *প্রিমিটিভ মাইন্ড* অর্থাৎ অবিকশিত মনন ছিল, এহেন দাবি ধোপে টিকবে না। তাই দেখা যায়, তৎকালীন বিজ্ঞানীরা একেশ্বরবাদের পক্ষে থাকা প্রমাণগুলো একেবারে উপেক্ষা করে যান! ড. কর্নেল গোয়ের্নার জানান:

> ল্যাংয়ের গবেষণায় ছোটখাট কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল বটে, তবে তার বইয়ের মূল বক্তব্য এমন সব তথ্যপ্রমাণ পেশ করেছিল যা কোনোভাবেই বিবর্তন তত্ত্বের সাথে মেলানো যাচ্ছিল না। কিন্তু সেকালের বিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্বে এতটাই

> মজে ছিলেন যে—এসব তথ্যপ্রমাণ দেখেও তারা না দেখার ভান করে এড়িয়ে যান।

হায়রে সত্য সন্ধানী বিজ্ঞানীকূল !

ড. হলপাইক যদিও এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এড়িয়ে গেছেন, তবে হারারিকে ছাড় দেন নি। হারারির বয়ানকে সমালোচনা করেছেন ভিন্নভাবে। হলপাইকের মতে স্রেফ আবেগ-অনুরাগ নয়, বরং জীবনকে নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার স্রোতেই একেশ্বরবাদের আবির্ভাব। মানুষ সুশৃঙ্খল এই বিশ্বজগতকে নিয়ে ভেবে দেখবার কারণেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করেছে। হারারির বক্তব্যকে আনাড়ির কল্পনা বলে আখ্যায়িত করে তিনি লিখেন:

> This is amateurish speculation, and Harari does not even seem to have heard of the Axial Age. This is the term applied by historians to the period of social turmoil that occurred during the first millennium BC across Eurasia, of political instability, warfare, increased commerce and the appearance of coinage, and urbanization, that in various ways eroded traditional social values and social bonds. The search for meaning led to a new breed of thinkers, prophets and philosophers who searched for a more transcendent and universal authority on how we should live and gain tranquility of mind, that went beyond the limits of their own society and traditions, and beyond purely material prosperity. People developed a much more articulate awareness of the mind and the self than hitherto, and also rejected the old pagan values of worldly success

|| and materialism.

অর্থাৎ, 'হারারি অক্ষীয় যুগের নাম শুনেছেন বলে মনে হয় না। অক্ষীয় যুগ বলতে প্রথম সহস্রাব্দের যুদ্ধ, রাজনীতি, বাণিজ্যের প্রসার, মুদ্রার উদ্ভাবন আর নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সামাজিক টানাপোড়েনের সময়টাকে বোঝানো হয়। এ সময়টাতে বিভিন্ন কারণে সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনগুলোতে ফাটল ধরা শুরু করে। জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে নতুন এক ধরনের চিন্তাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক সমাজের জন্ম হয়। তারা মানসিক শান্তি পাবার জন্য সার্বজনীন একটা জীবনযাত্রার মাধ্যম খুঁজতে থাকেন, যা সমাজ ও পার্থিব উন্নতিকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষ নিজের মন সম্পর্কে আগের থেকে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে, এবং সেই সাথে জাগতিক উন্নতি ও বস্তুবাদকেন্দ্রিক পৌত্তলিক মানসিকতাকে ছুড়ে ফেলে।'

ড. হলপাইকের মতে জীবনের অর্থদ্যোতনা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনাই একেশ্বরবাদের আবির্ভাবের পিছনে দায়ী। মানুষ সুশৃঙ্খল এই বিশ্বজগতকে নিয়ে ভেবে দেখবার কারণেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করেছে, কারণ অন্য কোনোভাবে এই সুশৃঙ্খলতা ব্যাখ্যা করা যায় না। হারারি নিজেও কথাটার সাথে একমত, তিনিও স্বীকার করেছেন, 'monotheism explains order'।

কিন্তু তিনি বলার চেষ্টা করছেন যে মানব সমাজ কোনো কারণ ছাড়াই, আবেগের বশবর্তী হয়ে বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসে আসার অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়। এর বিপরীতে হলপাইক বলছেন যে অন্ধভক্তির পরিবর্তে প্রকৃতি নিয়ে মানুষের যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনাই একেশ্বরবাদের প্রসার ঘটিয়েছে। যদি হারারির বক্তব্য সত্য হয়, তা হলে মানুষ জেনেবুঝে সিদ্ধান্ত নেয়নি। আর যদি হলপাইকের বক্তব্য সত্য হয়, তা হলে মানুষ ভেবেচিন্তেই সেই পথে এগিয়েছে।

এখানেই বিপত্তি।

কারণ নাস্তিকদের বয়ান অনুযায়ী এনলাইটেনমেন্ট-এ যুক্তিচর্চার দ্বারাই ধর্মকে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু হলপাইক বলছেন—না, বরং একেশ্বরবাদই যৌক্তিক চিন্তার ফসল।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

হারারির ভাষ্যমতে মাত্র ৫০০ বছর আগেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে। কথাটা ঠিক না। যদিও হারারি নিজে ইতিহাসে ডক্টরেট করেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস তার ভালোমতো পড়া না থাকায় বহুল প্রচলিত ভুল বয়ান বেছে নিয়েছেন, যা এনাক্রনিজমের দোষে দুষ্ট। খ্যাতনামা বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ ডেভিড লিন্বার্গ তার *The Beginnings of Western Science (University of Chicago Press, 2008)* বইয়ের শুরুতেই এই ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। বহু আগে থেকেই গ্রিক ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পাশাপাশি ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মধ্যেও প্রকৃতি নিয়ে জ্ঞানচর্চার চল ছিল। ধরনটা হুবহু আজকের বিজ্ঞানের মতো না হলেও সেটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার মধ্যেই পড়ে।

তবে হারারি আরও এমন কিছু বলেছেন যেটা পড়ে আমার হাসি পেয়ে গেছে। তিনি জোরগলায় দাবি করেছেন (পৃ. ৩২২):

> The discovery of America was the foundational event of the Scientific Revolution. It not only taught Europeans to favour present ob-

> servations over past traditions, but the desire to conquer America also obliged Europeans to search for new kowledge at breakneck speed. If they really wanted to control the vast new territories, they had to gather enormous amounts of new data about the geography, climate, flora, fauna, languages, cultures and history of the new continent. Christian Scriptures, old geography books and ancient oral traditions were of little help.

অর্থাৎ, 'আমেরিকা আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে একদিকে ইউরোপীয়রা বুঝতে পারল আদি কেতাবের চেয়ে নতুন পর্যবেক্ষণ বেশি জরুরি, অন্যদিকে এই নতুন দেশটাকে ভালো করে জানার প্রবল ইচ্ছা জাগল তাদের মধ্যে। নতুন পাওয়া এই জায়গাটাকে যদি দখলে রাখতে হয়, তা হলে সেই জায়গাটার সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য জোগাড় করা দরকার। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস—সব। খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ, ভূগোলের পুরোনো বই আর মানুষের মুখে মুখে শোনা গল্প—সব সেখানে অচল।'

কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের বুনায়াদি ঘটনা—হারারির মুখে এমন দাবি দেখে আমি যারপরনাই অবাক হয়েছি। আমারই মত অবাক হয়েছেন হারারির বইয়ের একজন পর্যালোচক, পুরষ্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও লেখক চার্লস ম্যান। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত রিভিউতে তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। হারারি তার দাবির স্বপক্ষে তিনি কোনো রেফারেন্স দেননি। আমার ক্ষুদ্র পড়াশোনাতেও এমন কোনো তথ্য আমি পাইনি। উপরন্তু সমসাময়িক অধিকাংশ বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদের মতে আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থান এতটাই ক্রমশ যে, পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কথাটাই সমস্যাযুক্ত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ স্টিভেন

শ্যাপিন তার *The Scientific Revolution (University of Chicago Press, 1996)* গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন,

> There was no such thing as the Scientific Revolution

অর্থাৎ, 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বলে কিছু ঘটেনি!'[৯] যা ঘটেছে তা পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক অন্য সভ্যতা থেকে ধার করা জ্ঞানের চর্চা, বিশেষ করে আরব ভূখণ্ড থেকে আসা জ্ঞান-বিজ্ঞান।

আদি কেতাবের চেয়ে নতুন পর্যবেক্ষণ বেশি জরুরি—এই অনুধাবন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জন্য শর্ত ছিল না। এটাও ইতিহাসের প্রপঞ্চময় উপস্থাপন। কুইনসল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ইতিহাসবিদ পিটার হ্যারিসন তার *The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science (Cambridge University Press, 1998)* গ্রন্থে দেখিয়েছেন পুরনো ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান বাদ দিয়ে নতুন জ্ঞান খোঁজার জন্য বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হয়নি। অনেকক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত স্রষ্টার ধারণাকে জগতের সাথে মেলাতে গিয়েই বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে। বাদ দিয়ে না।

বিজ্ঞান দ্বারা ধর্মের ভিত দূর্বল করে দেয়া নিয়ে হারারি আরো বলেছেন (পৃ. ২৭৯-২৮০):

> The Scientific Revolution has not been a revolution of knowledge. It has been above all a revolution of ignorance. The great discovery that launched the Scientific Revolution was the discovery that humans do not know the answers to their most important questions. Pre-modern traditions of knowledge such as Islam, Christianity, Buddhism and Confucianism asserted

> that everything that is important to know about the world was already known … It was inconceivable that the Bible, the Qur'an or the Vedas were missing out on a crucial secret of the universe—a secret that might yet be discovered by flesh-and-blood creatures

অর্থাৎ, 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব জ্ঞানের বিপ্লব না এনে বরং অজ্ঞতার বিপ্লব নিয়ে এসেছে। মানবজাতি তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর জানে না, এই মহাআবিষ্কারের মাধ্যমে বিপ্লবটি শুরু হয়। ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসিয়ানিজমের মত প্রাচীন মতবাদগুলো ধরে নিত যে মানবজাতির জন্য পৃথিবী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ যা জানবার দরকার ছিল তা তখনই জানা হয়ে গিয়েছিল। … রক্তমাংসের মানুষ দ্বারা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে কিন্তু বাইবেল, কুর'আন বা বেদে উল্লেখিত হবে না, বিশ্বজগতের এমন রহস্যের কথা ভাবাও যেত না।'

অন্যধর্মের ব্যাপারে জানি না, তবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এটা মেলে না। আপনি একজন সচেতন মুসলিমকে যদি প্রশ্ন করেন যে কুর'আনে বিজ্ঞানের জানা-অজানা সব তথ্য উল্লেখ করা আছে কি না, সে অবশ্যই না-বোধক উত্তর দেবে। কুরআনে বলা হয়েছে আমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে (১৭:৮৫), সৃষ্টিকর্তা এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পর্কে আমরা জানি না (১৬:৮), যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হতে মানা করা হয়েছে। (১৭:৩৬) কুরআনের বহু আয়াতে আমাদের পৃথিবী ঘুরে দেখতে বলা হয়েছে, আমাদের নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, আকাশ এবং পৃথিবী কীভাবে সজ্জিত, বিভিন্ন প্রাণির গঠন ও আচরণ ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে। এই ধরনের আরো অনেক নির্দেশ পাওয়া যায় কুরআনে। ওহীর উদ্দেশ্য মানুষের আদর্শিক ও নৈতিক কাঠামোকে ঠিক করা;

তাদের জীবনাচারের ছক বাতলে দেয়া। জগতের সবকিছু শিক্ষা দেয়া না।

আমরা আগেই দেখেছি, পুরনো ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান বাদ দিয়ে নতুন জ্ঞান খোঁজার জন্য বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হয়নি। অনেকক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত স্রষ্টার ধারণাকে জগতের সাথে একই সুরে মেলাতে গিয়েই বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে। ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *Monotheism and the Rise of Science (2020)* গ্রন্থে জে.এল.শেলেনবার্গ ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছেন কীভাবে একত্ববাদী ধর্মীয় চেতনা বিজ্ঞানের উত্থানের চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল। সমাজে প্রচলিত ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের চিরন্তন লড়াইয়ের যে বয়ান সেটাকে বাতিল করে ইতিহাস ঘেঁটে তিনি দেখিয়েছেন (পৃ. ৪১):

> ধর্ম ও বিজ্ঞান অনেক দিক থেকেই একে অপরের জন্য সহযোগী ছিল - হালফিলের পশ্চিমা সংস্কৃতির উত্থানের সময়, তার কিছু শত বছর পূর্বে এবং উত্থানের যথেষ্ট কিছু সময় পরও। তারা কোনোভাবেই প্রতিপক্ষ ছিল না, বরং ছিল বন্ধু। ... যখন বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্কের পুরো ছবিটা—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত—একাধারে বলা হবে, তখন ইতিহাসে পাওয়া অল্পকিছু বিরোধও ক্ষনিকের কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা মনে হবে।

যদি আপনারা একেশ্বরবাদের দিকে তাকান, তা হলে দেখবেন এই মতানুসারে বিশ্বজগতের নিয়মগুলো যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একজন সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বই কেবল মহাবিশ্বের সবকিছুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসামান্য শৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। নিউটন, প্রিস্টলিসহ আরো অনেক ইউরোপীয় বিজ্ঞানই এমন ভাবতেন, এমনকি গ্যালিলেও পর্যন্ত এমন ভাবতেন। আর এই ধারণাটাই নতুন কিছু আবিষ্কারের তাড়না হিসেবে কাজ করে। তা হলে যুক্তি জিনিসটা ধর্মের বিরুদ্ধে যায় এবং বিজ্ঞান এসে মানুষকে ধর্মের গোঁড়ামি থেকে

মুক্তি দিয়েছে এই ধারণাটা শুধু ভিত্তিহীনই নয়, অযৌক্তিকও বটে। হারারির কথাটাকে ইতিহাসবিরুদ্ধ বললে সেটা ভুল হবে না। কারণ বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে যারা সঠিক ধারণা রাখেন তারা ঘুণাক্ষরেও এমন কোনো কথা বলবেন না। বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে তো হারারির এই দাবি একেবারেই খাটে না। আব্বাসি খলিফাদের আমলে ইসলামি সাম্রাজ্যে যে জ্ঞানবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার মূলে ছিল কুরআন থেকে পাওয়া প্রেরণা, ইসলামি জীবনব্যবস্থার তাকাদা। (নাস্তিক) লেখক ড. জিম খলিলি এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে বলেন[২৩]:

> [T]he scientific revolution of the Abbasids would not have taken place if it were not for Islam, in contrast to the spread of Christianity over the preceding centuries, which had nothing like the same effect in stimulating and encouraging original scientific thinking.

অর্থাৎ, 'আব্বাসীয় আমলে যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব হয়েছিল, তার মূল কারণ ছিল ইসলাম। এর আগের শতকগুলোতে খ্রিস্টধর্মের প্রসারের সময় এমন নজির আমরা পাই না।'

বর্তমানে অনুকল্প তৈরি করে তার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গঠনের যে ধারা প্রচলিত তা মূলত চালু হয় হাসান ইবনু হাইছামের হাত ধরে। মুসলিম এই বিজ্ঞানী ছিলেন আলোকবিজ্ঞানের অগ্রদূত এবং প্রথম 'আধুনিক' বিজ্ঞানী। ইবনু হাইছাম নিজের অনুপ্রেরণা নিয়ে বলেছিলেন, "আমি গবেষণা করি আমার রবের নিকটবর্তী হবার জন্য।" তাকে অনুসরণ করে আরও বহুসংখ্যক মধ্যযুগীয় জ্ঞানতাপসের আগমন ঘটে। জাবির ইবনু হাইয়ানকে বলা হয় রসায়নের জনক। মূসা খাওয়ারিজমি বীজগণিতের সূচনা করেন। আল-বিরুনিকে অনেকে সর্বপ্রথম

NEWS

▶ Watch ONE-MINUTE WORLD NEWS

BBC

News Front Page
Africa
Americas
Asia-Pacific
Europe
Middle East
South Asia
UK
Business
Health
Science & Environment
Technology
Entertainment
Also in the news

Video and Audio

Programmes
Have Your Say
In Pictures
Country Profiles
Special Reports

Related BBC sites
Sport
Weather
On This Day
Editors' Blog
BBC World Service

The 'first true scientist'

By Professor Jim Al-Khalili
University of Surrey

Isaac Newton is, as most will agree, the greatest physicist of all time.

At the very least, he is the undisputed father of modern optics, or so we are told at school where our textbooks abound with his famous experiments with lenses and prisms, his study of the nature of light and its reflection, and the refraction and decomposition of light into the colours of the rainbow.

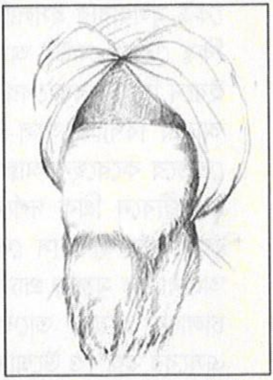

An artist's impression of al-Hassan Ibn al-Haytham

Yet, the truth is rather greyer; and I feel it important to point out that, certainly in the field of optics, Newton himself stood on the shoulders of a giant who lived 700 years earlier.

For, without doubt, another great physicist, who is worthy of ranking up alongside Newton, is a scientist born in AD 965 in what is now Iraq who went by the name of al-Hassan Ibn al-Haytham.

Most people in the West will never have even heard of him.

ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবনে সিনার অবদান অনস্বীকার্য।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখাতে শতাধিক মধ্যযুগীয় মুসলিম ও আরব বিজ্ঞানীরা অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের হাত ধরেই বিজ্ঞানের নতুন কোনো শাখার সূচনা হয়েছে।

ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্বজগতকে জানার বাসনা মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে ব্যাপকভাবে জ্ঞানচর্চার ধারা শুরু করিয়েছিল। যদিও গ্রিক দর্শনের প্রভাবে তাদের কেউ কেউ মূলধারার ইসলামি বিশ্বাস থেকে কম-বেশি বিচ্যুত হয়েছেন, কিন্তু তেমন কেউই আজকের ধর্মত্যাগীদের মত ধর্মবিদ্বেষি হন নি। ইবনে সিনা পরকালের বিশ্বাস নিয়ে ধন্দে ছিলেন, কিন্তু সেই তিনিই আবার বিখ্যাত আল-কানুন বই শুরু করেছেন বিসমিল্লাহ বলে, ভেতরে করেছেন আল্লাহ্‌র স্তুতি, জানিয়েছেন নবীর প্রতি সালাম। শেষজীবনে গ্রিক দর্শনের প্রভাব থেকে বেরও হয়ে এসেছিলেন জানা যায় ইতিহাস থেকে। সেকালের বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে নানা অপ্রমাণিত মন্তব্য প্রচারিত হয়েছে, অন্য কারো ধর্মবিরোধী বক্তব্য চালানো হয়েছে তাদের নামে। কিন্তু অ্যাকাডেমিকদের বিশ্লেষণে এসবের স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছে।

তৎকালীন পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে যেতেন এবং তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করে তাদের জীবনযাত্রায় নিজেদের অভ্যস্ত করতেন। তাদের কাছে তখন ইসলামি সংস্কৃতিটাই ছিল উৎকৃষ্ট। তারা নিজ দেশে গিয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখতেন, যার ফলে পশ্চিমা বিশ্বে ক্রমান্বয়ে এক নব জাগরণ শুরু হয়। নিউটনের বহু কাজে মুসলিমদের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।[২৪] এসবের কিছুই হারারি লেখায় নেই। তিনি চলে গেছেন কলাম্বাসের কোলে!

ইতিহাসের কী বিকৃত উপস্থাপন!

অ্যাকাডেমিকদের রায়

আজকের স্বল্প আলোচনায় চেষ্টা করা হলো বিশ্বব্যাপী মাতলামোতে পরিণত হওয়া বেস্ট-সেলার বইয়ের প্রকৃত অবস্থার অল্পকিছু দিক। সাধারণ পাঠকের এসবই অজানা, মুখে রোচে যেসব বই তার অধিকাংশেই গল্প থাকে বেশি। এই বাস্তবতা মুক্তচিন্তকদের আগে বুঝে আসার কথা। অথচ অবস্থা হয়েছে উল্টো। এ কেমন প্রগতী আর কেমন মুক্তচিন্তা আমার বুঝে আসে না।

বিবর্তনভক্ত, প্রগতিবাদীদের তো এই বই পড়ে দ্বন্দ্বে পতিত হওয়ার কথা। অথচ তারা প্রবল উৎসাহে এই বইয়ের গুণগান গেয়ে চলছে।

ড. হলপাইক খেয়াল করেছেন:

> Throughout the book there is also a strange vacillation between hard-nosed Darwinism and egalitarian sentiment... But a consistent Darwinist should surely rejoice to see such a fine demonstration of the survival of the fittest, with other species either decimated or subjected to human rule, and the poor regularly ground under foot in the struggle for survival.

অর্থাৎ, 'বইটি জুড়ে একরোখা ডারউইনবাদ আর সাম্যবাদী আবেগের মধ্যে টানাপোড়ন লক্ষ করা যায়। ... অথচ একজন সত্যিকারের ডারউইনবাদীর তো অন্য প্রজাতি ধ্বংস হওয়া কিংবা মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসা এবং দুর্বলের নিষ্পেষিত হবার মাধ্যমে যোগ্যতমের টিকে থাকবার নিয়মটির বাস্তবায়ন দেখে আনন্দিত হওয়ার কথা।'

যে বইয়ে স্বার্থপরতা এবং নিষ্ঠুরতার সাথে যুদ্ধ করাটাকে প্রকৃতিতে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যে বইয়ে মানবাধিকার থেকে নিজের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেই একই বইয়ে আবার শ্রেণীবৈষম্য দূর করে দিয়ে মানুষ-মানুষে সম্প্রীতির কথা বলা হচ্ছে! প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাছে তো নিজের টিকে থাকাটাই মূল উদ্দেশ্য, সেটা সোজা আঙুলে হোক কিংবা বাঁকা আঙুলে। অন্য প্রজাতির (কিংবা অন্য মানবসম্প্রদায়ের) সুখ-দুঃখ নিয়ে কিংবা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে তো বিবর্তনের মাথাব্যথা নেই। বরং অন্যদের ধ্বংস দেখে তো একজন ডারউইনবাদীর খুশিই হওয়া উচিত। কারণ বাকি সবার দমনের মাধ্যমে তার চিন্তাধারার সত্যিকারের বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে।

বলা হচ্ছে নৈতিকতা আসলে কাল্পনিক বিষয়, আবার নৈতিক বিষয়ে ফয়সালাও দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাস উপস্থাপনের নামে জল্পনা-কল্পনা ও খণ্ডিত ইতিহাস চর্চা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের লেপন দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে বস্তুবাদের বিশ্বাস। ধর্মের উৎপত্তির নামে বাতিল তত্ত্ব দিয়ে পাতার-পর-পাতা ভরাট করে ফেলা হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে রসালো গল্প। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঢুকে পড়ছে কাল্পনিক কথা। এমন সব অবতারণা যা বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদরা গ্রহণ করেন না। এরপরও এই বই সারাবিশ্বে বেস্ট সেলার হয়। বিপুল প্রশংসায় গুণমুগ্ধ হয় সাধারণ পাঠক। বিশ্বের পাঠক সাধারণের অবস্থা কি এতটাই শোচনীয়?

আমাদের স্বল্প আলোচনা শেষ করব বেশকিছু সেক্যুলার পণ্ডিতের উক্তি দিয়ে। যাদের কেউ কেউ হারারির কাজের কিছু প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু সমালোচনার আঘাতে প্রশংসার কুড়েঘর ভেঙ্গে পড়েছে। যেমন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত জন সেক্সটন বলেন[১]:

> [I]t does not contain much actual history. Rather, it is a speculative reconstruction of human evolution, supplemented by the author's thoughts on recorded history and the human condition. The book is fundamentally unserious and undeserving of the wide acclaim and attention it has been receiving

'এই বইতে প্রকৃত ইতিহাস তেমন একটা নাই। বরং আছে মানববিবর্তনের আনুমানিক অতীতচিত্র। এর সাথে যোগ হয়েছে নথিবদ্ধ ইতিহাস ও মানব-অবস্থা নিয়ে লেখকের ভাবনা। বইটা একেবারেই ছেলেমানুষিপূর্ণ এবং এত যে নামযশ কামিয়েছে তার মোটেই যোগ্য না।'

প্রাণরয়াসনবিদ ও মানবাধিকারকর্মী ড. গিডেয়ন পলিয়া বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে লিখেছেন[২৫] :

> *Sapiens. A brief history of humankind* is full of interesting and stimulating ideas, but inevitably as a global history it suffers from many important omissions due to a Eurocentric and indeed Anglocentric and Zionocentric outlook.

'*স্যাপিয়েনস* বইটিতে অনেক মুখরোচক ও আগ্রহ উদ্দীপক ধারণার দেখা মেলে। কিন্তু ইউরোপতান্ত্রিক—বিশেষ করে ইংরেজতান্ত্রিক ও জায়নবাদি মানসিকতা নিয়ে মানবজাতির সামগ্রিক

"স্যাপিয়েনস বইটাকে মানব-জ্ঞানভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলার সুযোগ নেই, বরং একে বিনোদন বলাই শ্রেয়।"

অ্যামিরেটাস অধ্যাপক ড. সি.আর. হলপাইক

ইতিহাস লিখার ফলে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এতে বাদ পড়েছে।'

নৃতত্ত্ববিদ ও এমিরেটাস প্রফেসর সি.আর. হলপাইক বলেন:

> Summing up the book as a whole, one has often had to point out how surprisingly little he [Harari] seems to have read on quite a number of essential topics. It would be fair to say that whenever his facts are broadly correct they are not new, and whenever he tries to strike out on his own he often gets things wrong, sometimes seriously.

> So we should not judge Sapiens as a serious contribution to knowledge but as "infotainment, a publishing event to titillate its readers by a wild intellectual ride across the landscape of history, dotted with sensational displays of speculation, and ending with blood-curdling predictions about human destiny. By these criteria it is a most successful book."

'পরিশেষে বলতে হয়, জরুরি অনেক বিষয়ে হারারি এতই অল্প পড়াশোনা করেছেন যে এটা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না—যখন হারারির আলোচনা মোটাদাগে সঠিক, সেগুলো হলো চর্বিত-চর্বন; আর যখন তিনি নিজের ব্যাখ্যা দাঁড় করান, প্রায়শই তা গলদ হয়। মাঝে মাঝে তো মারাত্মক গলদ। তাই *স্যাপিয়েনস* বইটাকে মানব-জ্ঞানভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলার সুযোগ নেই, বরং একে বিনোদন বলাই শ্রেয়। বইতে লাগামহীন মস্তিষ্কচর্চা করা হয়েছে মানবেতিহাসের উপর, উত্তেজনাপূর্ণ জল্পনাকল্পনা আছে দফায় দফায় আর আলাপ শেষ হয়েছে মানবের পরিণতি নিয়ে রক্ত গরম করা ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে। এভাবেই পাঠকদের সুড়সুড়ি দিয়ে বই বিক্রির বন্দবস্ত করা হয়েছে। এসবকে কোনো বইয়ের সফলতার মানদণ্ড হিসেবে বিচার করলে *স্যাপিয়েনস* অন্যতম সফল বইগুলোর একটি।'

অ্যানালাইটিক দার্শনিক গ্যালেন স্ট্রসনের মতে [২৬]:

> [T]he attractive features of the book are overwhelmed by carelessness, exaggeration and sensationalism... There's a kind of vandalism in Harari's sweeping judgments, his recklessness about causal connections, his hyper-Procruste-

> an stretchings and loppings of the data.

'বইয়ের আকর্ষণীয় দিক ছাপিয়ে দেখতে পাওয়া যায় গাফেলতি, অতিরঞ্জন আর উত্তেজক প্রলাপ ... ঢালাও মন্তব্য, লাগামছাড়া কারণ জুড়ে দেওয়া, উপাত্তকে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে সিদ্ধান্তে আসার ক্ষতিকর চর্চায় লিপ্ত হয়েছেন হারারি।'

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিভিউতে চার্লস ম্যান আক্ষেপ করে বলেন[৯]:

> "Sapiens" reminded me occasionally of a discussions on Reddit, where users sound off about supposed iron laws of history. This book is what these Reddit threads would be like if they were written not by adolescent autodidacts but by learned academics with impish senses of humor.

'*স্যাপিয়েনস* পড়ে আমার মনে হলো আমি যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রেডিটের পোস্ট পড়ছি। সেখানে কাউকে কাউকে দেখা যায় ইতিহাসের বিশ্লেষণে অভেদ্য সূত্র দাঁড় করায়। এই বইটাকেও রেডিটের কোনো বড়সড় পোস্টের সাথে তুলনা করা যায়, যা স্বশিক্ষিত কোনো কিশোরের লেখা নয়, বরং পাজি পণ্ডিতের লেখা।'

এবার সচেতন পাঠক নিজেরাই বিচার করুন।

সবার জন্য শুভকামনা রইলো।